ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত ক্রীড়া-সাপ্তাহিক

খেলার আসর

৭ নভেম্বর ১৯৮০



দিলীপ দোশি





পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্ক্যান ঃ সৌম্য ভৌমিক

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com



সম্রাট পেলে
১৮
লেখা ঃ অশোক চট্টোপাধ্যায়
রেখা ঃ জি সান্তা
জি লেইট
আমি তোমাদের জুতো এনে দেব। তোমরা রোজ প্র্যাকটিস করবে, নিয়ম মেনে চলবে, আর আমি তোমাদের কোচিং দেব
মুশকিল আসান করতে এলেন জি লেইট। তার তিন ছেলে খেলতো ৭ সেপ্টেম্বর দলে।
আমার বাবার চেয়ে কি ও ভালো কোচিং দেবে। তবু বলছে যখন জুতো দেবে....
কিন্তু আমরা জুতো পাব তো ? এতগুলো জুতো কোথায় মিলবে ?
সে ভাবনা আমার। কিন্তু তোমাদের এই ৭ সেপ্টেম্বর নামটা বদলাতে হবে
কেন ?
খালি পায়ের দল হিসাবে ৭ সেপ্টেম্বরকে বাউরু শহরে সবাই চেনে। এবার জুতো পায়ে দলের নাম হোক 'আমেরিকুইনহা।'
ক'দিন বাদে
যার যেটা পছন্দ পরে নাও। নরো এসট ক্লাবের ডিরেকটরদের বুঝিয়ে তাদের ক্লাবের বাতিল করা জুতোগুলো নিয়ে এসেছি
খোঁড়াচ্ছিস কেন ? বড় সাইজের একটা জুতো নে
ধেৎ ! এটা বেশ নতুন আছে
খালি পায়ে খেলে খেলে পা-টা এমন থ্যাবড়া হয়ে গেছে, কোন জুতোই পায়ে লাগে না
Pe do Pobre nao tem tamanho
গরীব মানুষদের পায়ের কোন সাইজ নেই
[চলবে]

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত ক্রীড়া-সাপ্তাহিক

খেলার আসর

বর্ষ ৪ ॥ সংখ্যা ২৭ ॥ ৭ নভেম্বর ১৯৮০

সুনীল গাভাসকরের নেতৃত্বে যে ভারতীয় ক্রিকেট দলটি নিউজিল্যাণ্ড ও অস্ট্রেলিয়া সফরে যাচ্ছে সে সম্পর্কে খোলাখুলি মন্তব্য বিশেষ প্রকাশ হয়নি। কারণ ক্রিকেট এমন এক খেলা যেখানে সাফল্য হচ্ছে বিচারের একমাত্র মাপকাঠি। এসত্ত্বেও বলা যায় বোর্ডের নির্বাচকমণ্ডলী দল নির্বাচনে কিছু নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। দীর্ঘদিন বাদে বিশ্ব ক্রিকেটের মান অনুযায়ী দু'জন ফাস্ট বোলারকে নির্বাচকেরা দলে নিয়েছেন। কপিলদেব ইতিমধ্যেই এক স্বীকৃত ফাস্ট বোলার। দ্বিতীয় ফাস্ট বোলার যোগরাজ সিংকে নির্বাচকরা এবং অধিনায়ক সুনীল গাভাসকর ভারতীয় ক্রিকেটের আবর্জনা থেকে তুলে নিয়ে এসেছেন। যোগরাজ সিং তিন বছর আগে হরিয়ানা থেকেই কিছুদিনের জন্য সর্বভারতীয় দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এমন কি সফররত এম সি সি-র সঙ্গে একটি খেলায় কপিলদেব-এর জায়গায় নির্বাচিত হন। এরপর হরিয়ানার ক্রিকেট থেকে যোগরাজ সিংকে নির্বাসিত করা হয় এবং কিছুদিনের জন্য ক্রিকেট থেকে সরে যেতে বাধ্য হন। ঘটনাচক্রে অবশ্য যোগরাজ আবার ক্রিকেটের মধ্যে চলে আসেন। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের মতে যোগরাজ প্রকৃত অর্থে একজন বিশ্বমানের ফাস্ট বোলার হওয়ার সম্ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন। যোগরাজ ছাড়া তামিলনাড়ুর শ্রীনিবাসন, বোম্বাই-এর সন্দীপ পাতিল এবং দিল্লির কীর্তি আজাদের নির্বাচন সময়োপযোগী হয়েছে। বিশেষ করে শ্রীনিবাসন, পাতিল ও আজাদ ভারতের ব্যাটিং শক্তিকে জোরদার করবেন একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এছাড়া বিশ্বনাথ, গাভাসকর সম্পর্কে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। দলের একমাত্র দুর্বল অংশ হচ্ছে স্পিন বোলিং। দোশি, শিবলাল যাদবরা ভারতের নরম মাটি ও স্পিন বোলিং-এর উপযোগী উইকেটে যে সাফল্য দেখাতে পেরেছেন, সেই সাফল্য অস্ট্রেলিয়ার শক্ত মাটিতে কতটা পাবেন সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। আর ভারতীয় স্পিন বোলিং সম্পর্কে স্বাভাবিক ভীতির বসেই অস্ট্রেলিয়ার উইকেট তৈরি হবে। এর আগে ভারত আরও তিনবার অস্ট্রেলিয়ায় গিয়েছে এবং দেখা গেছে প্রথম সফরে (১৯৪৭) ভিনু মাঁকড় ১৪টি, দ্বিতীয় সফরে (৬৭-৬৮) প্রসন্ন ২৫টি এবং তৃতীয় সফরে ('৭৮) বেদী ২৬টি ও চন্দ্রশেখর ২৮টি উইকেট পান। তৃতীয় সফরের সময়ে অস্ট্রেলিয়ার দল দ্বিতীয় শ্রেণীর ছিল। দোশি ও শিবলাল যাদবের স্পিন বোলিং অস্ট্রেলিয়ার দলকে কতটা ঘায়েল করতে পারবে বলা খুবই কঠিন। কাজেই ভারতীয় দলের টেস্টে সাফল্য নির্ভর করবে ভাল ব্যাটিং ও ফাস্ট বোলিং-এর ওপর। ভারতের চতুর্থ সফরের তালিকা দেখলেও বোঝা যাবে, খেলোয়াড়দের মনোবল ছাড়া আর যা প্রয়োজন হবে তা হল শারীরিক দক্ষতা। গত দু'বছরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ (প্যাকার খেলোয়াড়বিহীন), ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া (দ্বিতীয় শ্রেণীর) ও পাকিস্তানের বিপক্ষে অল্প বিস্তর সাফল্যের পর ভারতীয় দলকে এবার ক্রিকেটের অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে যেতে হচ্ছে।



সম্পাদক ঃ অতুল মুখার্জি

শিল্প নির্দেশক ঃ নিতাই ঘোষ

প্রতি সংখ্যা ঃ ১·৫০

বিমান মাশুল ঃ

পূর্বাঞ্চলে ২০ পয়সা, ভারতের অন্যান্য স্থানে ২৫ পয়সা

যা আছে



প্রচ্ছদের ছবি ঃ শংকর নাগ দাস

অন্যান্য ছবি ঃ পাহাড়ী রায়চৌধুরী, শংকর নাগ দাস, অরুণ মুখার্জি, সুব্রত সরকার প্রমুখ।

ডি সি এম ফুটবলে— মাঠের বাইরে

দিল্লি থেকে মিহির চৌধুরী

দিল্লির হিন্দি দৈনিক 'নব ভারত টাইমস'-এর ক্রীড়া সাংবাদিক কৌশিকের সঙ্গে আমি আর পাহাড়ী (রায়চৌধুরী) যখন আম্বেদকার স্টেডিয়ামে পৌঁছলাম তখন কাঁটায় কাঁটায় একটা। একটা পনেরো মিনিটে মহামেডান খেলবে ভিলাই স্টিল প্ল্যান্টের সঙ্গে। গেট পার হলেই সুরকী দেওয়া খানিকটা ফাঁকা জায়গা, তারপর স্টেডিয়ামে ঢোকার প্রধান দরজা। ওই সুরকী পথেই তখন মহমেডানের খেলোয়াড়রা প্র্যাকটিস করছেন। সুরজিত, শ্যামল ঘোষ, সাব্বির আলি ট্র্যাক স্যুট পরে এবং বাকীরা ড্রেস করেই প্র্যাকটিসে নেমেছেন। কোচ অমল দত্তের দেখা পেলাম না। ট্র্যাক স্যুট পরে সমরেশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন, একটু দূরে হায়দার আলি





স্টেডিয়ামে শান্ত মিত্রের সঙ্গে কথা বলছেন সুরজিত সেনগুপ্ত

ভিলাই স্টিলের বিরুদ্ধে মাঠে নামছেন মহমেডানের অমলরাজ, দেবাশিস, ভাস্কর ও গৌরাঙ্গ



ভিলাই স্টিলের বিরুদ্ধে অমলরাজ চতুর্থ গোল করছেন, কাছেই এস ভট্টাচার্য (২) ও আর পাল





রাজস্থান : বি এস এফ, খেলা দেখছেন জামশিদ ও মজিদ কাজল চ্যাটার্জি, তপন দাস, হাবিব সত্যজিত-ও অমিত গুহ

নস্কর। কথা বলছিলেন মহমেডান দলের আর এক কর্মকর্তার সঙ্গে।

খবর আছে, কলকাতার বেশ কিছু কর্মকর্তা এবার ডি সি এম দেখার জন্যে এসেছেন। উদ্দেশ্য নিছক খেলা দেখা? বোধহয় না। রুই-কাতলা যদি এই ফাঁকে জালে ওঠে। যাইহোক, মহমেডানের খেলোয়াড়েরা ড্রেসিংরুমে ঢুকলেন একটা দশ মিনিটে। এককোণে জে সি টি-র ইন্দার সিং দলের ছেলেদের সঙ্গে গল্প করছিলেন। আলাদা করে ডেকে নিয়ে কথা হল। ইন্দার ব্যক্তিগতভাবে খুব অমায়িক এবং ভদ্র। সঙ্গে সঙ্গে আমন্ত্রণ জানালেন ওদের হোটেল 'নিরুতে'। জিজ্ঞাসা করলাম গত খেলায় খেললেন না কেন? দার্জিলিং গোল্ডকাপের চোট এখনো সারেনি, দেখি দু'একটা ম্যাচ হওয়ার পর মাঠে নামতে পারি কিনা। তবে আমার ছেলেরা কিন্তু বেশ খেলছে--আরে হোটেলে আসুন অনেক বার্তাচিত হবে।'

ঠিক সোয়া একটা, খেলা আরম্ভ হতে চলেছে। হঠাৎ শান্ত মিত্র এবং এখানকার ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের লোকাল ম্যানেজার মামেক সিং (?)-এর সঙ্গে দেখা। শান্ত মিত্র পুরনো বন্ধু। শান্ত কি জাল হাতে? অগত্যা প্রশ্ন করতেই হল, কি ব্যাপার? অফিসের কাজে

দুই অধিনায়ক-রহিম ও অমলরাজ



মহঃ স্পোর্টিং ঃ দিল্লি ক্যান্টনমেন্ট— বলের নাগালে সাবির পাশে আকবর (৮) ও দলীপ (১২)





খেলা চলছে সাইড লাইনে মহমেডান দলের খেলোয়াড় ও কর্মকর্তা

না টিম ম্যানেজার হয়ে? পুরনো বন্ধুত্ব সর্বদাই নির্ভরযোগ্য আর বিশ্বাস্য। শান্ত চিরন্তন মিষ্টি হেসে উত্তর দিলেন, ফেডারেশনের সিলেক্টর হয়ে এসেছি। সঙ্গে স্ত্রী-পরিবার। বুঝতেই পারছেন ছুটির আমেজ, শীতের মেজাজ আর খেলার সঙ্গে সংযোগ। শান্ত মিত্র সপরিবারে উঠেছেন 'ফ্লোরা' হোটেলে। সেখানেও নিমন্ত্রণ। যেতেই হবে। সুভাষ ভৌমিকের ছেলে বুম্বা অসুস্থ। ক্যান্সার? শান্তকে জিজ্ঞাসা করলাম বাচ্চাটা এখন কেমন? বুম্বার চতুর্থ ইঞ্জেকসন ১৮ই হয়েছে, ষষ্ঠ ইঞ্জেকসন দেওয়ার আগে পর্যন্ত ডাক্তাররা কিছু বলতে পারছেন না। তবে বুম্বার কণ্ডিশন এখন বেশ ভাল। গত ২৫ অক্টোবর সুভাষের স্ত্রীর বাবা-মা বোম্বে গিয়েছেন নাতিকে দেখতে।

খেলা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। বুঝলাম সমরেশ (পিণ্টু) আজ দলের কোচ। চিন্ময় আর অমিত বাগচীর পরিবর্তে গৌরাঙ্গ আর ডেনিস পর্যায়ক্রমে যখন মাঠে এলেন তখন সমরেশই মাঠের বাইরে থেকে নির্দেশ দিয়ে খেলোয়াড় বদল করালেন। মহামেডান জিতল চার গোলে। রণেন অপূর্ব খেলেছেন, সুরজিৎ চোখে পড়ল না। যদিও সুরজিৎ বল ধরলেই ওর ছায়ায় বিপক্ষের চারজন ডিফেণ্ডার।

এরপরের খেলা কলকাতার রাজস্থানের সঙ্গে বি এস এফ-এর। গুজব খুব জব্বর, নরেন্দ্র গুরুং সাম্প্রতিক ফুটবলের বেস্ট লেফট উইং। কলকাতার জাল ওর ওপরে অবধারিত। মাঠে আজ কিন্তু গুরুং স্পার্ক দিলেও, প্রায়শ নিষ্প্রভ। নরেন্দ্র গুরুং? কলকাতায় একবার ঘুরে আসুক। দেখা যাক।

হাফ টাইমে দেখা হল অবনী আইচ, সুভাষ রায়, সোমনাথ ব্যানার্জি, দিলীপ পালের সঙ্গে। ওরা একসঙ্গে গ্যালারিতে বসে। একটু দূরে সত্যজিৎ মিত্র, হাবিব, কাজল চ্যাটার্জি পাশাপাশি বসে। খেলা দেখতে দেখতে সত্যজিৎ মন্তব্য করলেন রাজস্থান জিতবে। কালো চশমা চোখে হাবিব মৃদুস্বরে কি বলল শুনতে পাইনি। হাবিব যে বাংলা জানে আর বাংলায় কথা বলে এ অভিজ্ঞতা আমার প্রথম। সত্যজিৎ-হাবিবের খেলা চলাকালীন যা কিছু মন্তব্য সবই বাংলায়।

আলাপ হয়ে গেল মজিদ আর জামশিদের সঙ্গে। খাবাজন তখন অনুপস্থিত। কলকাতায় প্রখ্যাত দৈনিকে পড়লাম, আর এক ইরানী খেলোয়াড় ইস্ট বেঙ্গলের লিঙ্কম্যান হয়ে খেলবেন। মজিদ আমাকে আর পাহাড়ীকে স্টেডিয়াম ক্যাণ্টিনে 'চা' খেতে নিয়ে এলেন। প্রশ্ন করলাম, লিঙ্কম্যান হিসেবে আপনাদের কোন ইরানী খেলোয়াড় খেলবেন? মজিদ স্বল্পভাষী, জামশিদও তদ্রূপ। তবে মজিদ ইংরেজীতে রপ্ত। প্রশ্নটা আমাকেই করলেন। Do you know the condition of our mother land, Iran? বাঙালীর সেন্টিমেণ্ট আর জাতীয়তাবোধ নিয়ে প্রশ্ন করলাম; তোমার ফ্যামিলি কোথায়? তাদের খবর কি? মজিদ ভীষণ মুডভ হলেন। They are now in safe place. But I don't know their future. না, আর কোন ইরানী খেলোয়াড় ইস্ট বেঙ্গল দলে নেই। মজিদ, জামশিদ আমার বাড়িতে হয়তো আসবেন। কথা দিয়েছেন—বাঙালী খাবার খাবেন। জানিনা, আসবেন কিনা। তবে মজিদ মানুষ হিসেবে অতুলনীয়। যদিও কলকাতার মাঠ আর পরিবেশ ওর কাছে উৎকণ্ঠাময়, যা একজন খেলোয়াড়ের সহজাত প্রতিভা বিকাশে অন্তরায়। মজিদ যদি আমার ঘরে আসেন তবে আরো ঘরোয়া খবর আপনারা পাবেন।

২৭·১০·৮০

ছবি ঃ পাহাড়ী রায়চৌধুরী

অমল দত্ত টিমের সঙ্গে যাননি কেন?

স্টাফ রিপোর্টার

মহমেডান স্পোর্টিং দিল্লিতে ডি সি এম টুর্নামেণ্ট খেলতে যায় তাদের কোচ অমল দত্তকে ছাড়াই। তখন বলা হয়েছিল—অমল দত্ত পরে গিয়ে দলের হাল ধরবেন। কিন্তু মহমেডান দলের প্রথম দুটি খেলা হয়ে গেল, অমল দত্ত তখনও দিল্লি যাননি। দিল্লির খবর ঃ দুটি ম্যাচেই কোচের দায়িত্ব পালন করেছেন সমরেশ চৌধুরী।

কলকাতায় শোনা গেল অমল দত্ত ইচ্ছে করেই নাকি দিল্লিতে যাননি। কারণ দলের সঙ্গে তার কিছু মন কষাকষি হয়েছে। হয়তবা টাকাকড়ির ব্যাপারও আছে।

৩১ অক্টোবর দুপুরে ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ রফিক আমেদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে বললেন—'অমলবাবু অসুস্থ, টিমের সঙ্গে যেতে পারেননি। আমি ওর সঙ্গে যোগাযোগ করছি এবং যদি উনি সুস্থ থাকেন তবে দিল্লি যাবার জন্য অনুরোধ করেছি। সুস্থ থাকলে নিশ্চয়ই তিনি আজকালের মধ্যেই দিল্লি যাবেন। এর মধ্যে অন্য কোন ব্যাপার নেই।'

দলের সঙ্গে দিল্লিতে যেতে পারেননি অন্যতম গোলরক্ষক সন্তোষ বসু। জানা গেল ১৬ তারিখ প্র্যাকটিসে খুব কাছ থেকে একটি জোরালো সট ঠেকাতে গিয়ে ডান হাতে আঘাত পেয়েছেন। কব্জি ও হাতের তালুতে চোট পেয়েছেন। চিকিৎসকরা তাকে দিন দশেক বিশ্রাম নিতে বলেছেন—সুতরাং সন্তোষ ডি সি এমে খেলতে পারছেন না।



মহঃ স্পোর্টিং ঃ দিল্লি ক্যান্টঃ ; কোচ সমরেশ অমলরাজকে খেলার আগে কিছু নির্দেশ দিচ্ছেন

ডি সি এম ফুটবল মাঠের বাইরে ঃ দ্বিতীয় দিন

দিল্লির আম্বেদকার স্টেডিয়ামে ডি সি এম ফুটবল প্রতিযোগিতার দুটি খেলা আছে আজ। সোয়া একটায় বি এস এফ বনাম আই এ এফের খেলা। প্রায় একটা নাগাদ মাঠে ঢুকতে গিয়ে এক প্রবীণ ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা, মনে হল ওকে চিনি। আলাপ করে বুঝলাম আমার অনুমান সত্য। উনি পঞ্চাশ দশকের কলকাতার মাঠ কাঁপানো রাজস্থানের খেলোয়াড় 'জন'। সে যুগে রাজস্থান ছিল কলকাতার সম্ভ্রান্ত টিম। জন জানালেন বাঙ্গালোরে তারা অর্থাৎ প্রবীণরা বেশ মিলেমিশে প্রাক্তন খেলোয়াড়-দের নিয়ে আড্ডা আলাপ বা আলোচনা করেন। সে যুগের কিংবদন্তী খেলোয়াড় আমেদ খান, কিট্টু, কানাইয়ান, অরুময়, কেম্পিয়া, ভরদ্বাজ প্রমুখ এখন একই গল্পের শিবিরে। যদিও খেলোয়াড় হিসেবে কেউই এক দলে খেলেননি। জন প্রশ্ন করলেন, 'তোমরা কলকাতার লোক এতো ফুটবল ভালবাসো, আমাদের আজও মনে রেখেছ। এখন তো আমাদের ডেকে নিয়ে একটা প্রবীণদের খেলার আসর বসাতে পারো? আমরা এখনো কলকাতার দর্শকদের ভালবাসি, আজ যদি আবার তাদের সামনে খেলার সুযোগ পাই, মরার আগে তীর্থ দর্শন হবে।' জনের শেষ কথায় যন্ত্রণার আভাস।

বি এস এফ সুরকি বিছানো লনে প্র্যাকটিস করছে। শান্ত মিত্র সেই সময়ে মাঠে এলেন। ওর পাশে বসে খেলা দেখলাম। সাদামাটা খেলা। বি এস এফের বালবিন্দার সিং-এর খেলা শান্ত মিত্রের বেশ পছন্দ সই। যথার্থই বালবিন্দার বেশ ভাল খেলেছেন। হঠাৎ এয়ার ফোর্সের রাইট আউট সরকারকে দেখিয়ে বললেন, ওকে এবার ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবে নেওয়ার ইচ্ছা ছিল। কথাও কিছুটা এগিয়ে ছিল কিন্তু…। হঠাৎ 'গোল' চিৎকারে মাঠ উথলে উঠল, বি এস এফের প্রথম গোল। শান্ত'র কাছ থেকে সরকার প্রসঙ্গে আর কিছু শোনা হল না।

এরপরের খেলা সোয়া তিনটেয় কলকাতারই ইস্ট বেঙ্গল বনাম রাজস্থান। ঠিক পৌনে তিনটেয় বাসে করে মাঠে এল ইস্ট বেঙ্গল দল। মজিদ হচ্ছেন প্রধান আকর্ষণ। দিল্লির বাঙালীরা ভিড় করে এসেছেন ওর খেলা দেখতে। সত্যিই, মজিদ আজ মুগ্ধ করেছেন। বিব্রত করেছেন সত্যজিৎ মিত্র, বার বার ফাউল করে। স্টেডিয়াম থেকে 'শেম' 'শেম' আওয়াজ উঠেছিল কয়েকবার। কলকাতায় রাজস্থানের সঙ্গে ইস্ট বেঙ্গল এবার ড্র করেছিল—এদিন কিন্তু ইস্ট বেঙ্গল চার গোলে জিতেছে। খেলার শেষে রাজস্থানের প্রবীণ খেলোয়াড় বিজয় দিকপতি সখেদে মন্তব্য করলেন—'আমরা চিরকাল ইস্ট বেঙ্গলের সঙ্গে সমানে লড়াই করেছি, সম্ভবত রাজস্থানের বিপক্ষে ইস্ট বেঙ্গলের এটাই সর্বাধিক গোলের রেকর্ড।' শান্ত মিত্র একটু ভেবে নিয়ে দিকপতির কথায় সমর্থন জানালেন।

খেলার আগে আলাপ হল ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের জনৈক কর্মকর্তার সঙ্গে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'সামনের বছর কিরকম টিম হবে?' উত্তর দিলেন, 'দাঁড়ান মশাই, সামনেই ক্লাবের নির্বাচন, যদি জিতি তখন তো টিম করার কথা ভাবব।' প্রশ্ন করলাম, 'আজ হরজিন্দার নিশ্চয়ই ভাল খেলবে, এক রকম নিজের মাঠেই ও খেলছে।' একটু চুপ করে যা উত্তর দিলেন, তার সারমর্ম হল হরজিন্দর ওদের খুবই ডুবিয়েছেন, বেশ অসন্তুষ্ট মনে হল। খেলার দ্বিতীয়ার্ধে কিন্তু হরজিন্দর বেশ খেলেছেন।



রাজস্থানের চৌধুরী ইস্ট বেঙ্গলের জামশিদকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছেন



বলের দখল নিয়ে লড়াই—ইস্ট বেঙ্গলের হরজিন্দর-রাজস্থানের পি বিশ্বাস



রাজস্থানের বিরুদ্ধে খেলতে নামছে ইস্ট বেঙ্গল দল, সামনে বল হাতে অধিনায়ক সত্যজিৎ মিত্র পিছনে সমর ভট্টাচার্য ও অসিত গুহ।



টি-স্টলে জামশিদ ও মজিদ

খেলার আগে দুই অধিনায়ক রাজস্থানের এস পলসাই ও ইস্ট বেঙ্গলের সত্যজিৎ মিত্র



মজিদ রাজস্থানের বিরুদ্ধে প্রথম গোল করছেন



মাঠে বসে খেলা দেখেছি শান্ত মিত্রের পাশে বসে, মজিদ, সুধীর কর্মকার এবং কিছুটা হাবিবের খেলা যে আজ মনে ধরেছে তা ওর কথায় কথায় বোঝা গেল। খেলা শেষ হবার পর পাশের এনক্লোজারে শান্ত মুখ ঘুরিয়ে দেখতে পেলেন ওনার স্ত্রী শ্রীমতী নিয়তি মিত্রকে, কন্যা রেশমীসহ। আলাপ হল এবং বেশ কিছুক্ষণ গপ্প। শান্তর স্ত্রী বোধহয় এই প্রথম ফুটবল মাঠে এলেন। কলকাতার মাঠে উনি কোনোদিন খেলা দেখতে যাননি এমনকি ওর স্বামীর খেলাতেও না।

স্টেডিয়াম থেকে বেরোবার পর দেখা হল কাজল চ্যাটার্জির সঙ্গে। কাজল আজ খেলেননি, তবু খুশী খুশী ভাব। ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের সব খেলোয়াড়ের দেখা পেলেও গোলরক্ষক নাসির আমেদের দেখা নেই। 'কি ব্যাপার?' কাজল জানালেন, ওর অফিস টিম স্টেট ট্রান্সপোর্টের হয়ে কাশ্মীরে খেলতে গিয়েছেন, ওখান থেকেই দিল্লি ফিরে আসবেন।

ইন্দার সিং খেলা দেখছিলেন আর এক ব্লকে। ইশারায় কাছে ডাকলেন—আমন্ত্রণ জানালেন ওদের হোটেলে গিয়ে জে সি টি-র খেলোয়াড়দের সঙ্গে আলাপ করে আসার জন্যে। ইন্দার সিং-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের একটা প্রয়োজন আছে। অনেক গোপন খবরের ঝাঁপি উনি হয়তো এবার খুলে দেবেন। দেখি দু'একদিনের মধ্যে ওর সঙ্গে যোগাযোগ করে কি জানা যায়।

মাঠ থেকে বেরোবার সময় দেখা হল কলকাতার



রাজস্থানের গোলরক্ষক আপতার উদ্দীনের হাতে বল গলিয়ে গড়িয়ে পড়ছে, সামনেই এ চ্যাটার্জি (১৬)

রেফারি তারক সেন, সুধীন চ্যাটার্জির সঙ্গে। এছাড়া কুটিন হো এসেছেন ম্যাচ পরিচালনা করার জন্যে। ইস্ট বেঙ্গল-রাজস্থান খেলায় আজ বিনা দোষে জামশিদ, নাসিরিকে হলুদ কার্ড দেখালেন রেফারি হাওা। সে বিষয়ে প্রশ্ন করার ইচ্ছা ছিল এদের। আজ সুযোগ হল না। তবে প্রশ্নটা মনে গেঁথে আছে পরে করবো।

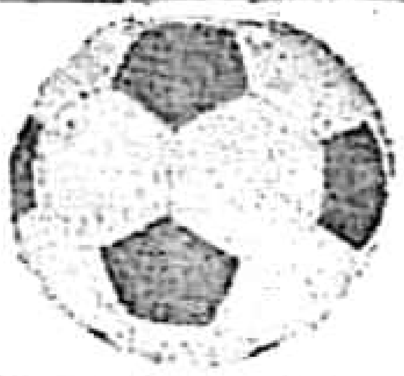
ক্রিকেট মাঠ ফিরোজ শা কোটলার দিকে যেতে যেতে প্রায় সন্ধে হয়ে এল। ওখানে অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যাণ্ড গামী ভারতীয় ক্রিকেট দল প্র্যাকটিস করছে। যদি কোনো যোগাযোগ হয়। পথেই দেখা হয়ে গেল দিল্লির জনৈক ক্রিকেট কর্মকর্তার সঙ্গে। দল নির্বাচন নিয়ে প্রায় আধ ঘণ্টা আলোচনা হল। যোগরাজ সিং কোন মানদণ্ডে ভারতীয় দলে এলেন তার সদুত্তর উনি দিতে পারেননি। যোগরাজ হরিয়ানার ছেলে তবে বোম্বে ঘেঁষা। আর কীর্তি আজাদ—মন্ত্রীপুত্র? কারসন ঘাউড়ি কি এখনো যোগ্য? চেতন চৌহান কি একটিও সেঞ্চুরি করেছেন? প্রখ্যাত বিনি কাপড় মিলের রাজপুত্র রজার বিন্নির যোগ্যতার মাপকাঠি? ভদ্রলোক কোনো তর্ক করলেন না. বরং বললেন সুনীল ওয়ালসনের ওপর খুব অবিচার হয়েছে। সুনীলের এবার সুযোগ পাওয়া উচিৎ ছিল। যজুর্বিন্দ্র সিংকেও ডাকা যেতো। এছাড়া আরো কিছু উঠতি খেলোয়াড় সম্পর্কে ভাবা যেতো, কিন্তু ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের নির্বাচকগণ কার হাতে বাঁধা তা ওর জানা নেই। জানা নেই আমাদের অনেক অনেক প্রশ্নের উত্তর। যাইহোক, ফুটবল থেকে ক্রিকেটের প্রসঙ্গে বেশি না যাওয়াই ভাল। এখানেই ইতি।

২৯-১০-৮০

ছবি: পাহাড়ী রায়চৌধুরী



রাজস্থানের বিরুদ্ধে খেলা। সাইড লাইনে ইস্ট বেঙ্গলের খেলোয়াড়রা। কাজল, সুভাষ, তপন, সোমনাথ, দিলীপ পাল, সুমিত, দিলীপ পালিত ও বিশ্বাস



মহঃ স্পোর্টিং-এর সুখী পরিবারে ভাঙন ? কেউ কি দল ছাড়বে ? অন্য দল থেকেই বা কারা আসতে চায়

স্টাফ রিপোর্টার

মহমেডান স্পোর্টিং কি 'সুখী-পরিবার' আছে ? তাহলে কেউ কেউ দল ছাড়তে চাইছেন কেন ? এবং ছাড়তে চাইছেন যাঁরা গতবার ইস্ট বেঙ্গলকে কানা করে দিয়েছিলেন ! আবার কর্ম-কর্তারাই বা নতুন 'তরুণ' মুখের দিকে অত তাকাচ্ছেন কেন ? মহঃ স্পোর্টিং কি ইস্ট বেঙ্গল বা মোহন বাগান থেকে কাউকে চায় ? তারা কারা ?

কলকাতা ফুটবলের সবচেয়ে উত্তেজনার পালা শুরুর এখনও অনেক বাকি—অর্থাৎ দলবদলের পালায় এখনও চার মাস। সুতরাং ও নিয়ে ভাবনা চিন্তা এখনই নয়। সেটাই স্বাভাবিক মনে হবে। তিন প্রধানের অন্যতম মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ রফিক আহমেদও প্রশ্ন শুনে হাসলেন—'সে তো অনেক বাকি, এখনই কি ?' জানতাম তিনি এই উত্তরটাই দেবেন। প্রশ্ন করলাম—'সত্যিই কি আপনি মনে করেন অনেক সময় রয়েছে, এখনই দল নিয়ে ভাবনা চিন্তার কিছু হয়নি ?' ডাঃ রফিক উত্তর না দিয়ে নীরবে হাসলেন।

খোলা মনের সপ্রতিভ মানুষ ডাঃ রফিক। আলোচনায় মাঝে মাঝেই বিব্রত হচ্ছিলেন প্রশ্ন শুনে। জানতে চাইলাম—'আপনি কি মনে করেন, এবছর অনেক পয়সা খরচ করে যে টিম তৈরি করেছেন—আগামী বছর তা অটুট থাকবে ?'

'দেখুন কে চায় সাজানো ঘর ভেঙ্গে যাক।' ডাঃ রফিকের উত্তর। তিনি আপাতঃ এই চূড়ান্ত উত্তরের পরেও যখন বললেন—'ক্লাব কোন খেলোয়াড়ের সঙ্গে এমন 'বিহেভ' করেনি যার জন্য আমরা কোন খেলোয়াড়ের থাকা না থাকা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করতে পারি।' তখন স্বভাবতই মনে হচ্ছিল তিনি নিঃসংশয় নন।

এ কথাটা মহমেডান কর্তৃপক্ষের প্রায় সকলেই বলেন। একদম প্রথমে অর্থাৎ মরশুম শুরুর মুহূর্তে খেলোয়াড়দের,—বিশেষ করে নতুন আসা খেলোয়াড়দের মুখে শুনতাম কর্মকর্তা ও তাদের আচরণের প্রশংসা। মনে আছে ক্লাব সভাপতি এরফান তাহেরের সঙ্গে মরশুমের শুরুতে আলোচনার কথা। তিনি বলেছিলেন—'হ্যাঁ আমরা খেলোয়াড়-দের দলে নিয়েছি ভাল 'সুযোগ' দিয়ে। খেলোয়াড়রা আমার টিমে এসেছে—কারণ ওরা যে সুযোগ সুবিধা চায় তা আমরা দিয়েছি এবং আমরা মনে করি এটা নিশ্চয়ই অন্যায্য নয়। চারদিকে সবকিছুই যখন বাড়ছে তখন এদেরই বা সুযোগ সুবিধা বাড়বে না কেন ! ওদের দাবী তাই, অন্যায় নয়।' তাকে বড় বেশী তৃপ্ত ও সুখী মনে হয়েছিল সেদিন. অনেক কিছু আলোচনা করলেন। মনে হল ভদ্রলোক বেশ উদার। তারপর আর তার সঙ্গে তেমনভাবে আলোচনা হয়নি। কিন্তু যেটুকু জানি, তাতে তার সুখটা এখন আর অটুট নয়। খেলোয়াড়দের দাবী মেটাবার পরও সারা বছর ধরে স্টার খেলোয়াড়দের নানা বায়নাক্কায় তিনিও বিব্রত। খেলোয়াড়দের ক্লাব তাঁবুতে দেখলে মনে হয় 'সুখী সংসার'। কিন্তু তাই কি ? নিভৃত আলোচনা করলে দেখা যাচ্ছে অনেকের মনের সুরই বেসুরো। অথচ তাদের বলবারও কিছু নেই। ক্লাব কর্তাদের ঢিলে ভাবকে কাজে লাগিয়ে ডেভিড উইলিয়মস ক্লাবের ক্ষতি করেছেন। গোলরক্ষক সন্তোষ বসু একরকম কর্তৃপক্ষের অমতেই বিদেশ ঘুরতে গেলেন—মনে রাখতে হবে তখন দার্জিলিংয়ে গোল্ডকাপএ খেলা। মহমেডান বলতে গেলে একজন গোলরক্ষককে নিয়ে টুর্নামেণ্ট খেলতে গেল। ক্লাব সন্তোষ সম্পর্কে তেমন কোন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। বড় টিম বড় খেলোয়াড়দের জন্য যেটুকু সহ্য করে, যে ব্যবস্থা নেয় মহমেডান তাই করেছে। যারা দল ছেড়ে এসেছেন তাদের প্রতি দৃষ্টিটা যেন একটু বেশীই দিয়েছে। তবুও তো অনেকেই চাইছেন দলবদল করতে। কিন্তু স্বীকার করছে কে ?

ডাঃ রফিককে জিজ্ঞেস করলাম—'আপনারা বলেছিলেন, ভারতের সেরা ফরোয়ার্ড লাইন আপনার টিমের, অথচ পারফরমেন্স তা বলে না। ফরোয়ার্ড লাইন নিয়ে কি নতুন কিছু ভাবছেন ?'

'ভাবতে তো হচ্ছেই, কারণ অস্বীকার করে লাভ নেই যে আশানুরূপ ফল আমরা পাইনি।' এ প্রসঙ্গে রফিকের বক্তব্য : দল তরুণ খেলোয়াড়দের দিকেই দৃষ্টি দেবে। মোহন বাগান বা ইস্ট বেঙ্গলের কোন স্টার খেলোয়াড়ের কথা ওরা ভাবছেন না। বেশ জোর দিয়ে বললেন, বাইরের দিকেও তাদের দৃষ্টি নেই। কিন্তু এক্ষেত্রে একটি অন্যতম সমস্যা তরুণ খেলোয়াড়দের বেছে নেবেন কোন নিরীখে। খেলোয়াড়রা তো খেলাই দেখাতে পারলেন না। কে কেমন ফর্মে আছেন, তাও তো পরিষ্কার নয়। 'তবে দেখা যাক, ডি সি এম, ডুরাণ্ড, রোভার্স এবং ন্যাশনাল থেকে কিছু পাওয়া যায় কিনা'। ডাঃ রফিকের মন্তব্য।

মহমেডানের ফরোয়ার্ডদের মধ্যে ডেভিড বেপাত্তা, গত সেপ্টেম্বর থেকে সাজ্জাদও চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ায় দলছাড়া। দেবাশিস বড় দলে যোগ্য মর্যাদা পেলেও অন্য দুই বড় দলে খেলবার আগ্রহ পোষণ করেন। সাব্বির দল ছাড়তে চাইলেও গতবারের ঘটনা তার সাধ পূর্ণ হতে দেবে না। অমিতের কথা নিয়ে ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব গভীরভাবে ভাবছে এবং সুমিতও আশা করে দাদার সঙ্গে একই টিমে খেলবেন। আকবরও দাদা হাবিবের সঙ্গে একই দলে খেলতে আগ্রহী এবং ইস্ট বেঙ্গল আকবরের জন্য অনেক দূর যেতে রাজি। এ প্রসঙ্গে মহ-মেডানের একজন কর্মকর্তা বললেন—'দাদার টিমে ভাই খেলবে, না ভাইয়ের টিমে দাদাকে খেলতে হবে সেটা দেখুন।' অর্থাৎ এতদিন দাদা ভাইকে 'টেনেছেন'—এবার ভাই 'টানবেন' দাদাকে। কিন্তু আকবর যদি মহমেডানে থাকবার শর্ত হিসাবে দাদাকে আনতে চান তাহলে ক্লাবের সামনে তা হবে সমস্যা। কারণ কোচ অমল দত্ত সম্পর্কে কর্মকতারা বেশ আস্থাশীল। হাবিব কি অমল দত্তকে মেনে নেবেন ? ওদিকে হাবিব চাইবেন অন্তত আগামী মরশুমটা নিজের 'দাম' ঠিক রেখে বড় দলে খেলতে। এবং সে দল নিশ্চয়ই ইস্ট বেঙ্গল অথবা মহমেডান স্পোর্টিং। এবং এক্ষেত্রেও আকবরকে পাবার সুযোগ বেশি ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের। সুতরাং সবদিক বিচার করলে ডাঃ রফিক যে বলেছেন বাইরের দিকে দৃষ্টি দেবেন না। তা শেষ পর্যন্ত রক্ষাও করতে পারবেন না।



ভাস্কর কি দল ছাড়বেন ?

লিঙ্কম্যানে; অমলরাজ, প্রশান্ত, সমরেশ এবং বলা যায় পেম দোরজি। অমলরাজকে এ মরশুমেই ইস্ট বেঙ্গল পেত। কেবল ছোট্ট একটা ভুলের জন্য পায়নি। আগামী মরশুমে আকবর ছাড়া অন্য যে খেলো-য়াড়টিকে পাবার জন্য ইস্ট বেঙ্গল অনেক কিছু পণ করেছে সে এই অমলরাজ। তাকে কোন বাঁধনে মহমেডান বাঁধবে এটা একটা সমস্যা। প্রশান্ত যদি সুযোগ পান পুরনো দলে যেতে চাইবেন, তা নির্ভর করছে ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের নিবাচনের উপর। প্রশান্ত যদি যেতে পারেন তবে চিন্ময় এবং ভাস্করও যাবেন। এবং সেক্ষেত্রে পিন্টুর ইচ্ছা—অর্থাৎ ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবে এসে অবসর নেওয়া সম্ভব হবে। পিন্টু সম্বন্ধে মহমেডানও খুব আগ্রহী নয়। তবে পেমকে তারা সুযোগ দেবেন।

ডাঃ রফিককে জিজ্ঞেস করেছিলাম 'ভাস্কর দল ছাড়তে চাইছে এমন একটা কথা শুনেছি, আপনি কি বলেন ?'

প্রশ্নটা শুনে চমকালেন না, বললেন—'কেবল ভাস্কর নয়, আমরা চাইব যাতে সকলেই দলে থাকে। ভাস্কর কেন যাবে ? আমরা এমন কিছু শুনিনি।' তবে ভাস্করের হয়ত দল ছাড়া হবে না। তবুও দলে আরও একজন গোলরক্ষকের প্রয়োজন একথা ডাঃ রফিকও অস্বীকার করলেন না।

'ভাস্কর মাইতি কলকাতায় খেলতে চাইছেন। আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে কি ?'



সাধারণ সম্পাদক ডাঃ রফিক আমেদ। ছবিঃ শংকর নাগ দাস

'না তেমন কিছু তো শুনিনি।'

'যদি হয় তাহলে ভাস্কর মাইতিকে আপনারা নিচ্ছেন?'

'ইট ইজ টু আর্লি টু সে'—হেসে ফেললেন ডাঃ রফিক।

'প্রতাপ ঘোষ কেমন গোলকিপার?'



আকবর—কাবিরের সঙ্গে খেলবেন? কোন দলে?

'ভালই খেলে, ভাল গোলকিপার।'

ডাঃ রফিক বলেননি। কিন্তু মোহন বাগান প্রতাপকে তেমন না খেলানোয় তার সম্বন্ধে মহমেডানের অনেকেই ভাবনা চিন্তা করছেন।

মহমেডান দলের দু'জন ব্যাকও মনে করছেন এবার দল ছাড়া উচিত। এবং তারা সম্ভবত সুযোগও পাবেন। সুতরাং ডাঃ রফিকের ঘর অটুট থাকবার নয়। অবশ্যই উনি তা খোলাখুলিভাবে স্বীকার করেন বা বলেন তাও নয়। তবে সভাপতি তাহের আলি সহজে হারবার পাত্র নন। তিনি এ'সব কিছু চিন্তা করেন, জানেন। ডি সি এম থেকে ন্যাশনাল—সব টুর্নামেন্টে তিনি নিজে যাচ্ছেন এবং যাবেন। এবং তার চেয়েও বড় কথা দলের খেলোয়াড় সংগ্রহে ও খেলোয়াড় ধরে রাখতে যে মানুষটির ভূমিকা সব থেকে বেশি তিনিও সক্রিয়। দার্জিলিং, গ্যাংটক, দিল্লি সর্বত্রই তাকে দেখা যাচ্ছে। ময়দানের পুরনো লোক তার উপর ও নিজের পকেটের উপর তাহের সাহেবের ভরসা অনেক। কিন্তু এত করে কি হবে যদি খেলাই না হয়?

এবারের লিগ, শিল্ড বন্ধ করে দেওয়া প্রসঙ্গে ডাঃ রফিক বললেন—'খেলা বন্ধ হওয়াটা খুব খারাপ ব্যাপার। অনেকদিন পর আমরা আশা করেছিলাম সদস্য সমর্থকদের আশা পূর্ণ করব, কিন্তু হল না। সব কিছুই ব্যর্থ হল'।

'খেলা বন্ধ হওয়াটা কি ঠিক হয়েছে?'

'ঠিক হয়নি নিশ্চয়ই।' ডাঃ রফিক বললেন 'বন্ধ হয়ে নানা দিকে ক্ষতি হল, ক্ষতি খেলোয়াড়দের, দর্শকদের। ক্ষতি আমাদেরও। খেলা না হলে সদস্য থাকবে কেন? চ্যারিটি ম্যাচ যেগুলো হয় এবার তাও হল না। অর্থাৎ এ'বাবদে আমরা যা পেতাম তাও পেলাম না। খেলোয়াড়, দর্শকদের যেমন,—তেমনি আমাদেরও এতে মন ভেঙ্গে পড়েছে।'

ডাঃ রফিকের মতে শুধু তার টিম নয় ইস্ট বেঙ্গল, মোহন বাগান ও অন্য দলগুলিও আগামী মরশুমে আর্থিক সঙ্কটে পড়বে। খেলা শুরু না হলে কার্ড রিনিউ করতে

অমলরাজ—ইস্ট বেঙ্গলে যাবেন?

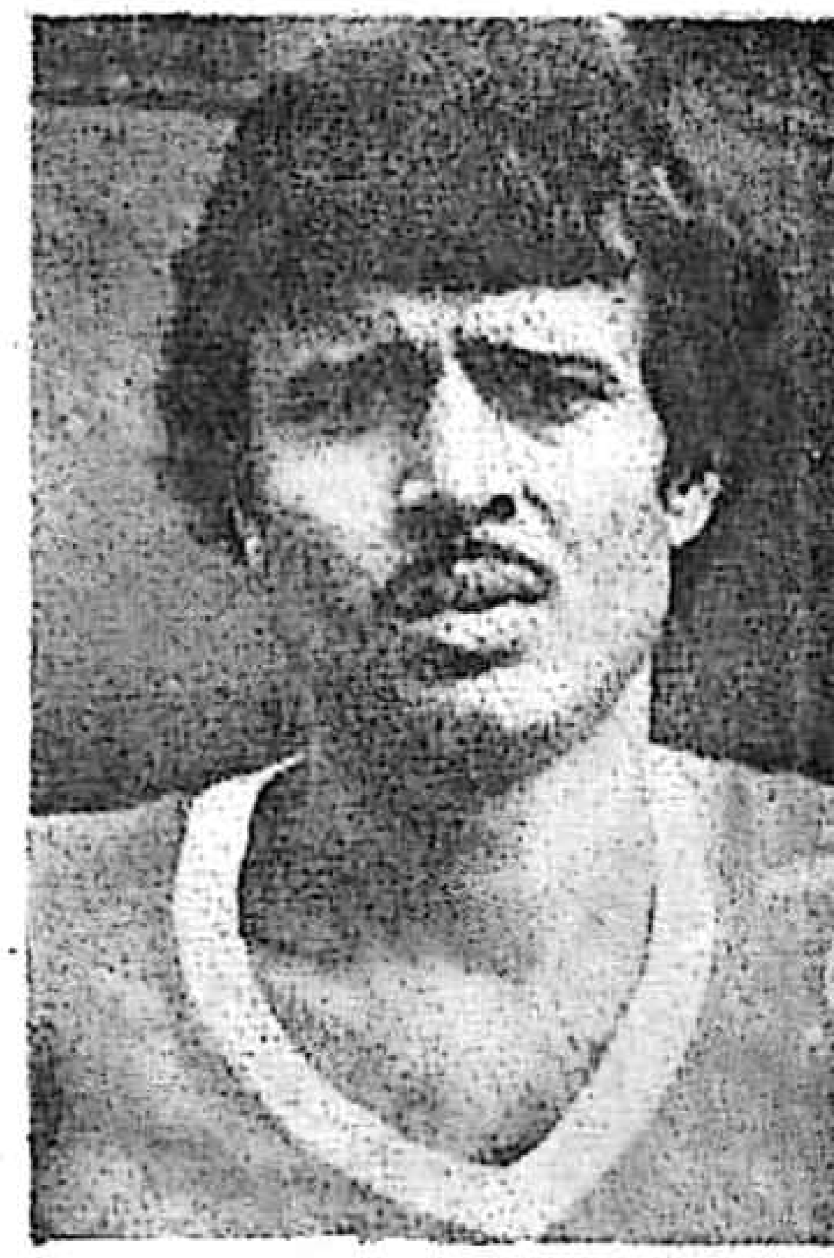


সদস্যরা উৎসাহী হবেন না। যদিও মহমেডান স্পোর্টিং ইতিমধ্যে কার্ড রিনিউ করবার জন্য নোটিশ দিয়েছে। তবে একথাও তো ঠিক সদস্যদের টাকার ওপর ভরসা করে ক্লাব চালান যায় একথা ওরাও মানেন না।

এ'বছর যে কারণে, যে শঙ্কায় জন্য খেলা বন্ধ করা হল, আগামী বছর কি সেই শঙ্কা থাকবে না?

ডাঃ রফিক বললেন—'এ নিয়ে আমরা ভেবেছি। ইস্ট বেঙ্গল-মহমেডান, বা বড় দলে—বড় দলে খেলা হলেই যদি রায়ট বা অশান্তির ভয় থাকে, প্রশাসন পিছিয়ে যায় তা'হলে খেলা হবে কি করে? আর খেলা যদি না হয় তা'হলে কি টিম থাকবে? টিমকে রাখতে হলে এ বিষয়টা ভাবতেই হবে। আমাদের প্রেসিডেন্টের বাড়িতে মোহন বাগান ও ইস্ট বেঙ্গল প্রতিনিধিদের নিয়ে একদফা আলোচনা হয়েও গেছে। এবং কথা আছে ডুরাণ্ডের পর তিন দল মিলে আবার আলোচনা হবে। একটা উপায় বের করতেই হবে।'

ডাঃ রফিক এই মুহূর্তে দল গঠন করার থেকে খেলার পরিবেশ গড়ে উঠবে কিনা, খেলা আগামী মরশুমে শুরু হবে কিনা, হলেও শেষ হবে কি না এ সমস্যা নিয়ে ভাবিত। তিনি স্বীকার করলেন—বড় দল হিসাবে তাদেরও কিছু করবার আছে। তবে তার টিম 'সাম্প্রদায়িক' এটা মানতে তিনি রাজি নন। একটু হেসে বললেন—'টিমটা দেখে কি তাই মনে হয়? আমরা টিম করতে, সদস্য নিতে তেমন কোন মনোভাবের ইঙ্গিত দিয়েছি কি?'



সমরেশ চৌধুরী—ইস্ট বেঙ্গলে গিয়ে অবসর নিতে চান?

মোহন বাগান রোভার্সের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে

স্টাফ রিপোর্টার

কলকাতার তিন প্রধানের দুই প্রধান ইস্ট বেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং এখন কলকাতার বাইরে। দিল্লিতে ডি সি এম টুর্নামেন্টে। মোহন বাগানও কলকাতার বাইরে, নভেম্বরের শুরুতেই ২ নভেম্বর দল শিলচরে যাচ্ছে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলতে। ২ ও ৩ তারিখ দুটো ম্যাচ। যাবার আগে ওরা ক'দিন নিয়মিত প্র্যাকটিস করলেন। ২১ অক্টোবর থেকে প্রায় প্রতিদিন দলের খেলোয়াড়রা মাঠে এসেছেন। মাঠের চেহারা বদলেছে, ক্রিকেটের জন্য চলছে প্রস্তুতি।

মোহন বাগান দল প্রতিযোগিতামূলক খেলায় খেলেছে সেই ১৬ আগস্ট, ইস্ট বেঙ্গলের বিরুদ্ধে। তারপর লিগ, শিল্ড বন্ধ, দার্জিলিং, গ্যাংটক গোল্ড কাপেও দল যায়নি। ডি সি এমেও নয়। তবে দল রোভার্সে যাচ্ছে। রোভার্সে প্রথম খেলা নভেম্বরের মাঝামাঝি অর্থাৎ তিন মাস খেলোয়াড়রা কোন প্রতিযোগিতামূলক খেলায় খেলতে পারেননি। প্র্যাকটিসও বেশ কিছুদিন বন্ধ ছিল। তবে রোভার্সে যাবার আগে দল জোর প্র্যাকটিস করে যাবে। দলনায়ক কম্পুটন দত্তের অভিমত—'অনেকদিন আমরা কোন কম্পিটিশন ম্যাচ খেলিনি। প্র্যাকটিসেও ফাঁক থেকে গেছে, তবুও আমরা নিশ্চয়ই চেষ্টা করব। যাবার আগে অন্তত দিন পনের সিরিয়স প্র্যাকটিসের সুযোগ পাচ্ছি'।

দলের সকলেই প্রায় প্র্যাকটিসে আসছেন। উলাগানাথন দেশে যাওয়ায় মাঠে আসছেন না। ডিসুজাও দিল্লিতে কবে কলকাতায় আসবেন কেউ বলতে পারলেন না। এ ছাড়া অন্যরা প্রায় সকলেই শিলচরে যাচ্ছেন। কেবল ব্যতিক্রম সঞ্জীব চৌধুরী। 'পায়ে চোট থাকবার জন্যই যেতে পারছি না। গেলে ভাল হত'।

১-১১-৮০



অনেকদিন পর মোহন বাগান দল মাঠে নেমেছে প্র্যাকটিস করতে, বাঁদিক থেকে মানস, বিদেশ, মিহির, কেষ্ট মিত্র পায়াস, অরুণ ঘোষ ও প্রসূন
ছবি: অরুণ মুখার্জি

দ্বন্দ্ব বন্ধ

প্রবাল দত্ত



তোলা থাক এবছর
বল, বুট, জার্সি।
মাছ ধরো এবছর
আনো ছিপ বঁড়শি।
কিংবা মারতে পারো
ক্যারামের ঘুঁটিকে
বেছে নাও, নইলে
তাস পেটা জুটিকে।
কারণটা কিছু নয়
ফুটবল বন্ধ,
ময়দানে এবছর
থাকবে না দ্বন্দ্ব।

অধিনায়ক গাভাসকর নারাজ কেন ?

ছবি ও লেখা
দিল্লি থেকে পাহাড়ী রায়চৌধুরী

২৮ অক্টোবর দিল্লির ফিরোজ শা কোটলা মাঠে যখন গেলাম তখন বেলা তিনটে—ফাঁকা মাঠ। অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড সফরের জন্য নির্বাচিত ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্র্যাকটিস হচ্ছে এখানে। কিন্তু দুপুর একটা নাগাদ প্র্যাকটিস শেষ করে ভারতীয় দলের নির্বাচিত খেলোয়াড়রা ফিরে গিয়েছেন তাদের হোটেলে, হোটেল 'জনপথ'-এ। ফিরোজ শা কোটলা মাঠের অন্যতম কর্মকর্তা সুখেন্দু ভট্টাচার্য (প্রাক্তন টেস্ট আম্পায়ার) পরের দিন বারোটা নাগাদ আসতে বললেন। বেরোবার পথে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল মিঃ প্রাসাদের সঙ্গে। ভারতীয় দলে নবাগত টি ই শ্রীনিবাসনের ভাই। কলকাতায় বাড়ি আছে। বাংলা জানেন। তিনি মোটর বাইকের পেছনে করে নিয়ে এলেন হোটেল 'জনপথ'এ। রজার বিন্নি তখন লাউঞ্জে বসে। একের পর অনেকের সঙ্গে দেখা হল। কপিলদেব পরের দিন মাঠে যাবার জন্য অনুরোধ করলেন।

পরদিন ঠিক বারোটায় ফিরোজ শা মাঠে যেতেই সুখেন্দুবাবু সঙ্গে সঙ্গে মাঠে নিয়ে গেলেন। সকলেই প্র্যাকটিস করছেন, শুধু অধিনায়ক গাভাসকর চেয়ারে বসে লক্ষ করছেন প্র্যাকটিস। গাভাসকরকে অনুরোধ করলাম, 'কিছু ছবি তুলতে চাই, যদি অনুমতি দেন'। 'স্যরি, প্রেসকে সাহায্য করতে পারবো না। ইউ হ্যাভ টু টেক পারমিশন ফর্ম দি চেয়ারম্যান অব দ্য ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড।' 'কিন্তু চেয়ারম্যান তো এখন বোম্বে আছেন?' 'দেন কন্টাক্ট আওয়ার ম্যানেজার'। ম্যানেজার দুরানী তখন বাইরে, কখন আসবেন জানা নেই। গাভাসকরকে আবার অনুরোধ করলাম। নির্লিপ্ত হয়ে উত্তর দিলেন, 'প্লেয়াররা যদি ব্যক্তিগতভাবে ছবি দেয় তাহলে আমার আপত্তি নেই। তবে আমি আমার ছবি দেব না। খেলোয়াড়দের প্র্যাকটিস করার ছবিও দেব না।' এরই ফাঁকে ফাঁকে ওর অজান্তে কয়েকটা ছবি নিয়ে নিলাম। রজার বিন্নি এসে গাভাসকরের কাছে বসলেন, সবে বল করে এসেছেন। বিশ্বনাথ ব্যাট করছেন. বল করছেন কপিল। নির্বাচিত খেলোয়াড়দের সকলেই আছেন। ইতিমধ্যে গাভাসকর মাঠে চলে গেলেন। প্র্যাকটিস করতে।

কপিল পিচের বাইরে এসে প্রথমে জল খেলেন, তারপর যোগরাজ সিং-কে ডেকে কিছু বোঝালেন, ওর কয়েকটা ভুল ডেলিভারি শুধরে দিলেন। যোগরাজ কপিলের চেয়েও স্বাস্থ্যবান, সুন্দর চেহারা। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আজাদ সাহেবের ছেলে কীর্তি আজাদ দলে স্থান পেয়েছেন। ওকে অনুরোধ করতেই ছবির জন্য পোজ দিলেন। যোগরাজও যেমন ভাবে বললাম তেমনি ভাবেই দাঁড়ালেন।

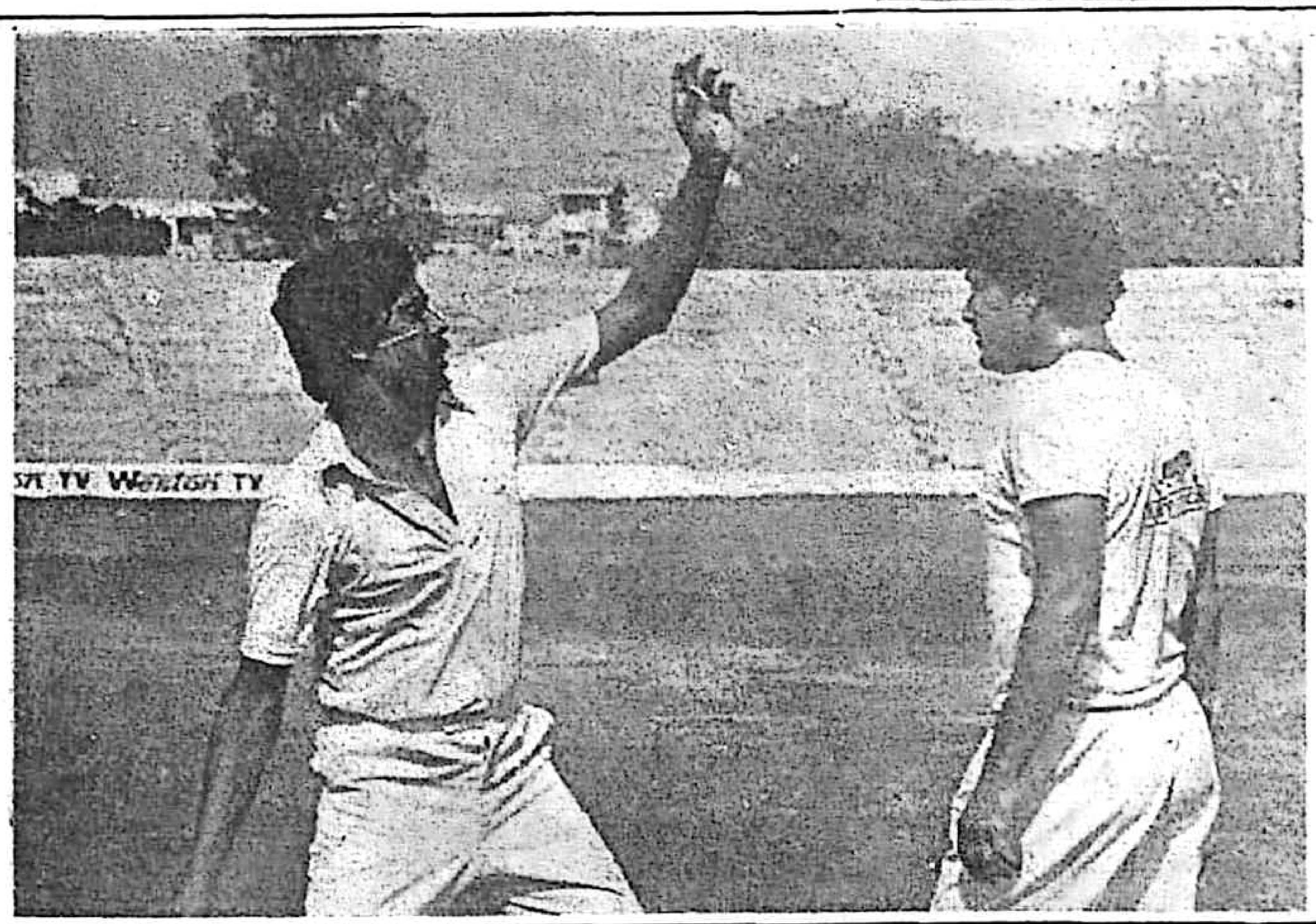
বিশ্বনাথ, কপিল, কীর্তি আজাদ, যোগরাজ, বেঙ্গসরকর, একে একে ফিরে এসে চেয়ারে বসলেন। দিলীপ দোশী তখন বল করতে গেলেন। ব্যাট করছেন চৌহান। অন্যদিকে প্র্যাকটিস দেখছেন নাদকার্নী। একদিকে একটা উইকেট পুঁতে কারসন ঘাউড়ি আর রজার বিন্নী ক্রমাগত বল করে চলেছেন। ঠিক পাশেই ব্যাট হাতে একে একে চৌহান প্রমুখ ব্যাট করছেন, বোলার দিলীপ দোশী।

ঠিক একটায় প্র্যাকটিস শেষ। খানিকক্ষণ আড্ডা এবং লেবু জল খেয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে গেলেন সবাই। নাদকার্নী'র ছবি নিলাম। সবার শেষে আসছেন গাভাসকর। ছবি নেওয়া বারণ। উনি নাকি কোনো প্রেসকেই বিনা টাকায় ছবি দেবেন না। দিল্লির দু'একজন প্রেস ফটোগ্রাফারদের তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন। মাঠেই ঢুকতে দেননি। এদিনটা কিন্তু আমার পক্ষে শুভ। বেশ কিছু ছবি তোলা হল। যদিও গাভাসকরের বিনা অনুমতিতে এবং

হোটেলের লাউঞ্জে রজার বিন্নী



কি ভাবে বল ডেলিভারি করতে হবে—কপিল দেখাচ্ছেন যোগরাজকে

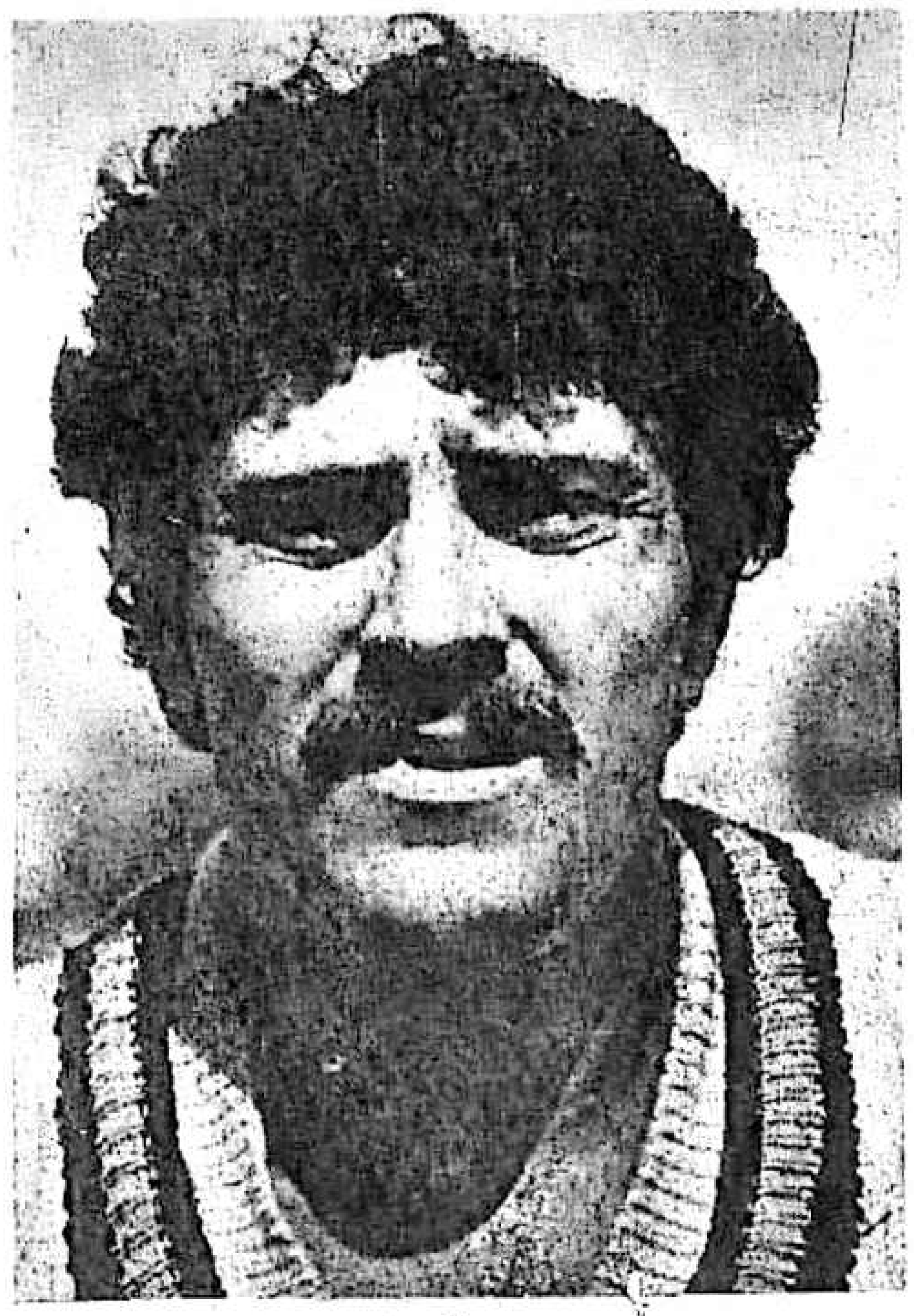




পাশাপাশি দুটি নেটে প্র্যাকটিস। একটি ফাস্ট বোলারদের জন্য, একটি স্টাম্প। অন্যটিতে স্পিন বলের মোকাবিলা করছেন 'ব্যাটসম্যানরা'



শ্রীনিবাসন—টেস্টে প্রথম সুযোগ

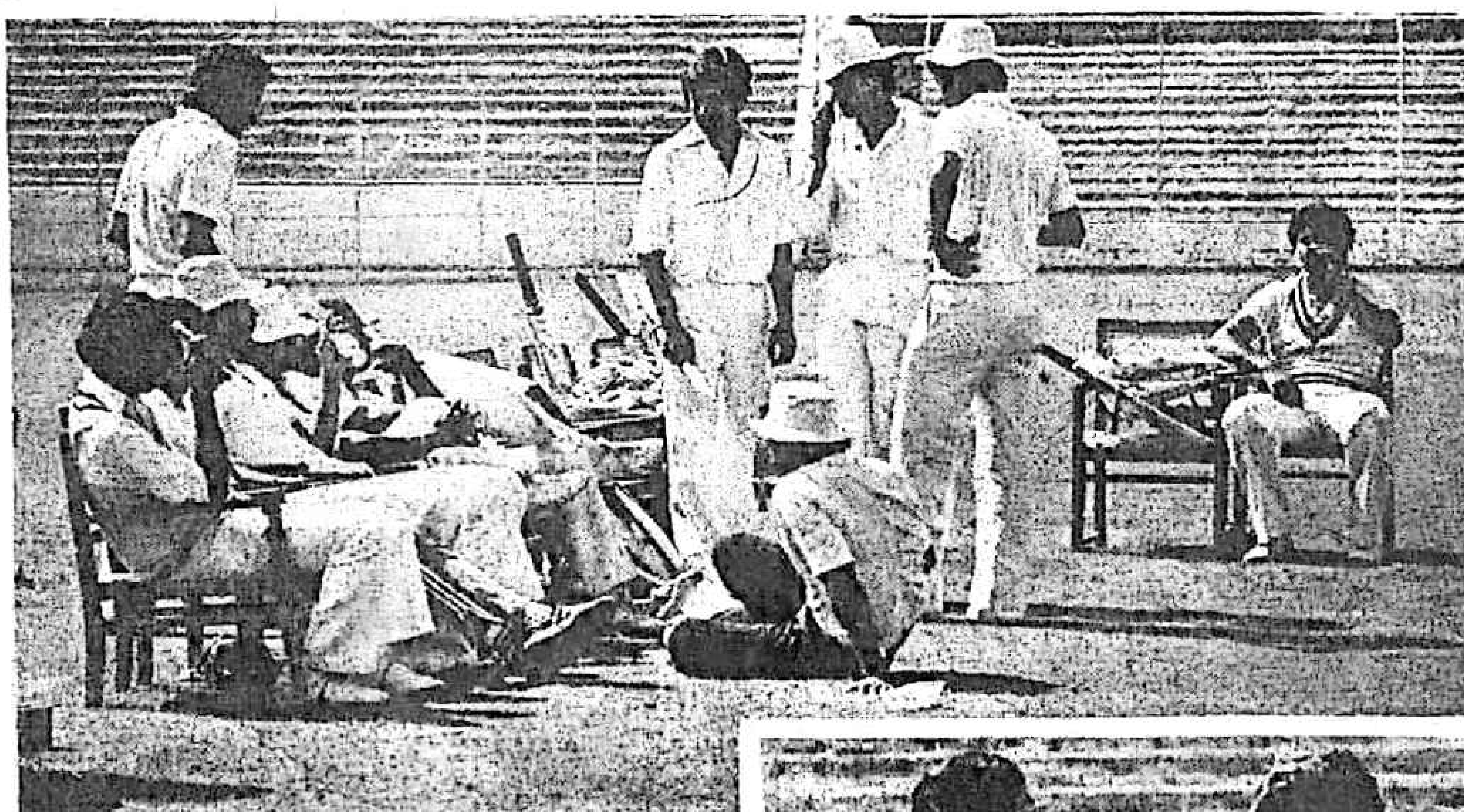


যোগরাজ সিং—দলে নতুন

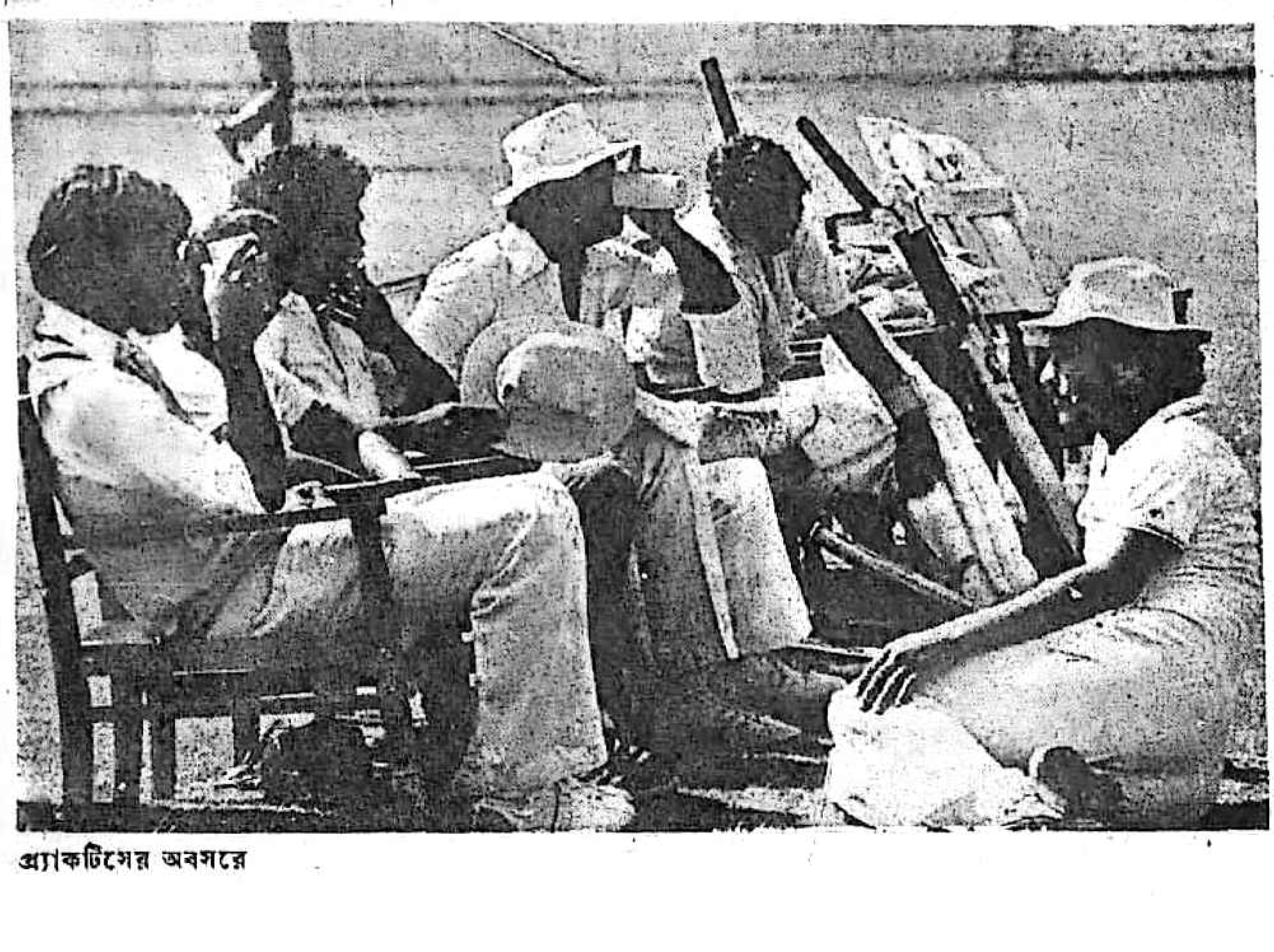


কীর্ত্তি আজাদ—ভারতীয় দলে নতুন মুখ

অজ্ঞাতে। দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি বম্বের সঙ্গে যুক্ত প্রেস ফটোগ্রাফাররা কিন্তু বেশ ভাল ভাবেই প্র্যাকটিসের ছবিগুলি এ দু'দিনে তুলে নিয়ে গিয়েছেন। এ সম্পর্কে মন্তব্য নাই বা করলাম।



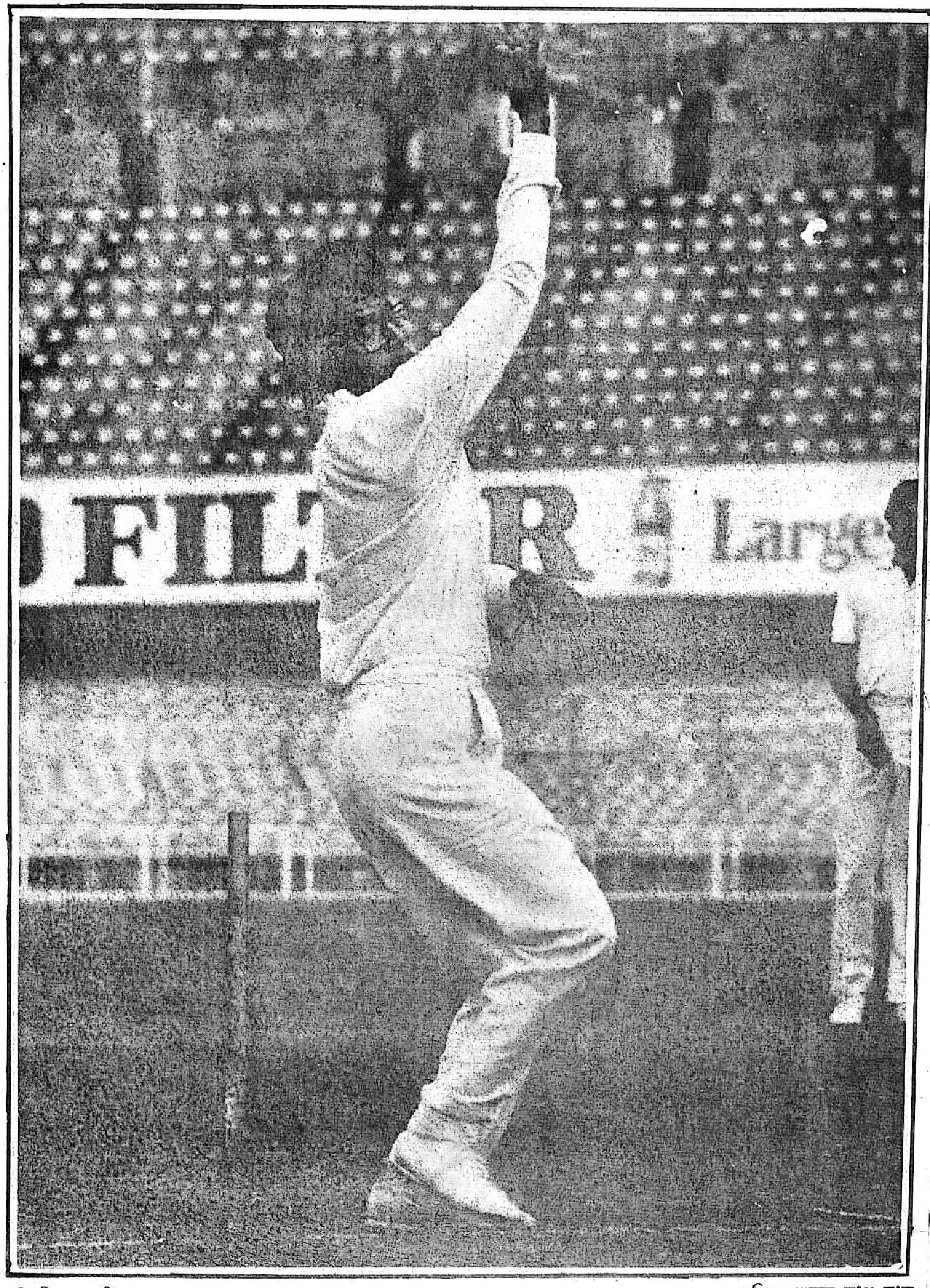
প্র্যাকটিস শেষে



প্র্যাকটিসের অবসরে



কপিল দেব- এই গ্লাভস চলবে কি ?



দিলীপ দোশি

ছবি ঃ শঙ্কর নাগ দাস

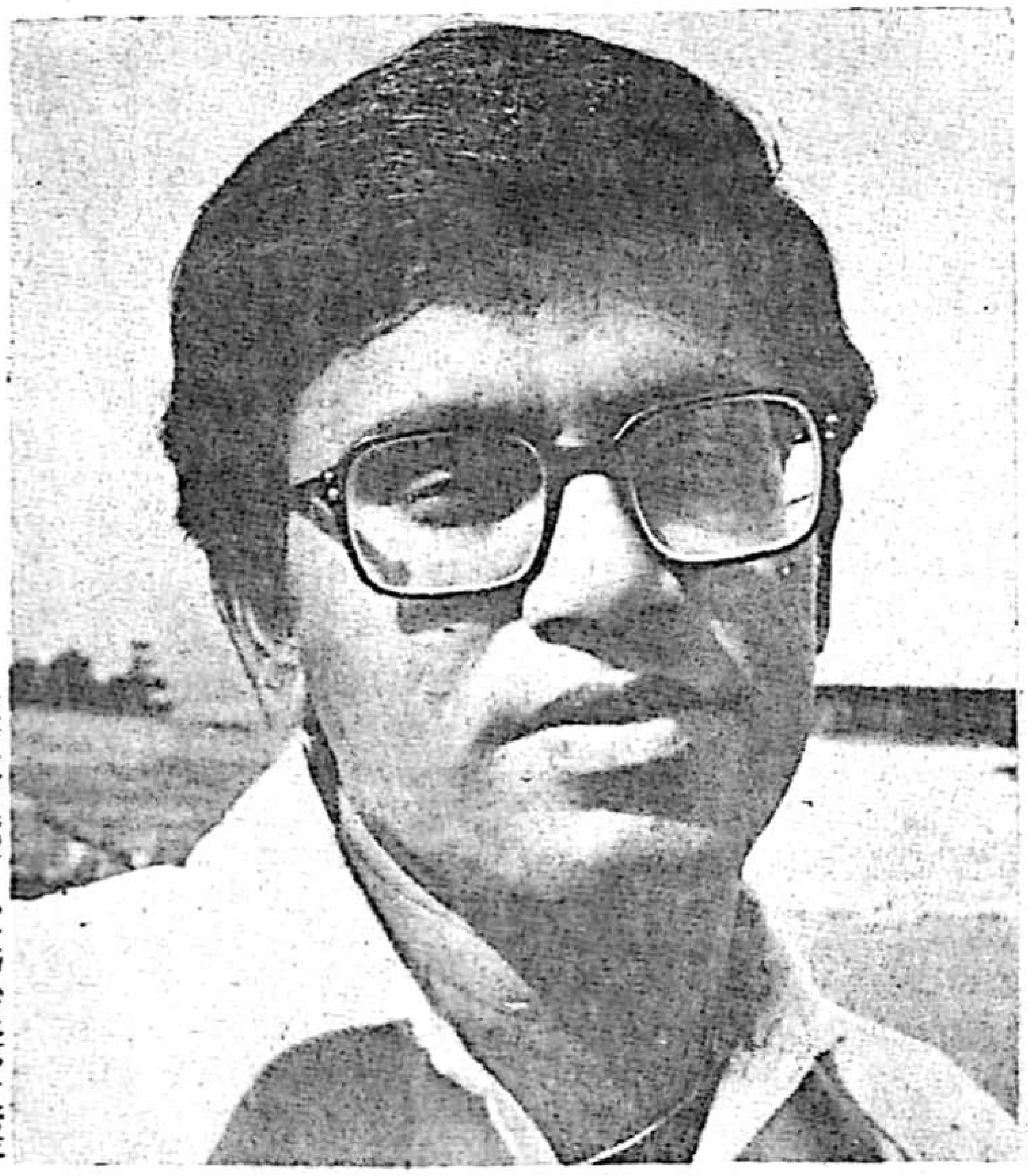
দিলীপ দোশি টেস্ট দলে এসেছেন নিজের গুণে ? না—সুনীলের সুপারিশে ?

অতুল মুখার্জি

ভিনু মাঁকড়ের পর বিষেণ সিং বেদী। দুজনেই ন্যাটা স্পিন বোলার। ভারতীয় নির্বাচকরা ভারতীয় দলের পাকিস্তানের সফরের কথা মনে রেখেছিলেন বোধহয়। ভারত তিনটির মধ্যে দুটি টেস্টে বিশ্রীভাবে হেরে ফিরে আসে। ১৯৭৯ জুনে ইংল্যাণ্ড সফরের সময় চন্দ্রশেখর ও বেদী দলে রইলেন। প্রসন্ন খালি বাদ পড়ে যান। কিন্তু নির্বাচকরা এবং অন্য সকলেই বুঝতে পেরেছিলেন, ভারতের ত্রয়ী-স্পিনার প্রসন্ন, বেদী ও চন্দ্রশেখরের পালা শেষ। নতুন স্পিনার চাই, অথচ মনের মত পাওয়া যাচ্ছে না অথবা নাম মনে পড়ছে না।

ভারতে বাংলার পক্ষে রঞ্জি ট্রফি খেলেছেন গাভাসকরের আগে থেকেই। কিন্তু টেস্ট দলে আসার কোন সুযোগ হয়নি। নির্বাচকদের কাছে দিলীপ দোশির কথা কে মনে করিয়ে দেন? কারণ ভারতীয় নির্বাচকদের মনে করিয়ে দিতে হয়। দশাননের মত তাদের দশদিকে চোখ রয়েছে। কাজেই একজনের চোখে পড়ে গেলেন দিলীপ দোশি। কারণ আর কিছুই নয়। ইংল্যাণ্ডে গিয়ে বেদী ও চন্দ্রশেখর বিধ্বস্ত হয়ে ফিরে এসেছেন। চন্দ্রশেখরের তবু হয়ত এখনও আশা আছে আবার একদিন টেস্ট দলে ফিরে আসার। বেদী আর নয়। প্রসন্নকে আগেই খরচের খাতায় লিখে দেওয়া হয়েছে। তবুও নিন্দুকেরা নাকি বলেন, অনেকদিনের বন্ধু সুনীল গাভাসকরই দিলীপের কথা নির্বাচকদের কাছে বলেন। অন্তত ভাঙা টিম অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি? গাভাসকরের সঙ্গে দিলীপের বন্ধুত্ব হয়েছে নানা সূত্রে। একসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় একাদেশের পক্ষে। এমনকি ১৯৬৮-৬৯ সালে নিউজিল্যাণ্ড একাদশের বিপক্ষে সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় একাদশের অধিনায়ক দিলীপ দোশির সঙ্গে সুনীল গাভাসকরও খেলেছেন। দিলীপের নেতৃত্বে পূর্বাঞ্চল বিশ্ববিদ্যালয় দল গাভাসকরের পশ্চিমাঞ্চলকে রীতিমত নাস্তানাবুদ করে হারায় ওই সময়। তবে গাভাসকরের বিয়ের ব্যাপারে দিলীপই নাকি প্রাথমিক ঘটকালির সূত্রপাত ঘটান আলাপের মধ্য দিয়ে। তবে তার অনেক আগেই দিলীপ দোশি আর সুনীল গাভাসকরের ক্রিকেটের রাস্তা আলাদা হয়ে গিয়েছে। দিলীপ দোশি যেখানে রঞ্জি ট্রফি, দলীপ ট্রফি খেলছেন বাংলা ও পূর্বাঞ্চলের পক্ষে, গাভাসকর সেখানে বিশ্ব-ক্রিকেটের মধ্যে নিজের স্থান করে নিয়েছেন।

রঞ্জি ট্রফিতে বছরের পর বছর ভাল বল করা সত্ত্বেও দিলীপ দোশি ভারতের টেস্ট ক্রিকেট থেকে দূরে রইলেন। কারণ ভারতের নির্বাচকদের সামনে ত্রয়ী স্পিনারের সাফল্য অন্য কোন স্পিনারের কথা ভাববার কোন সুযোগই দেয়নি। আর ত্রয়ী স্পিনার ছাড়া অল রাউণ্ডার (মিডিয়াম পেস আর স্পিনার) বেঙ্কটরাঘবন রয়েছেন। কাজেই



দিলীপ দোশি, ছবি : [illegible]

দিলীপ দোশি, মহারাষ্ট্রের শিভলকার বাংলার ও দিল্লির রাজীন্দর গোয়েলেরা টেস্ট ক্রিকেটের পর্দার আড়ালেই রইলেন। প্রত্যেকেরই বয়স হয়ে যাচ্ছে।

তবে দিলীপ দোশি বরাবরই উদ্যোগী। নিজের ক্রিকেট খেলার ভাগ্যকে জয় করার জন্য ইংলিশ কাউন্টি ক্রিকেটে খেলার ব্যবস্থা করলেন। দিলীপ ১৯৭১ সালেই বুঝতে পেরেছিলেন, ভারতের ত্রয়ী স্পিনারের ব্যূহ ভেদ করে টেস্ট দলে স্থান পাওয়া খুবই কঠিন শুধু নয়, যে সমর্থন থাকলে টেস্ট দলে স্থান পাওয়ার সুযোগ হয় সেটা কখনও পাননি। পূর্বাঞ্চলের প্রতিভাবান ক্রিকেটারদের মত দিলীপ দোশিকে রঞ্জি ট্রফি, দলীপ ট্রফি খেলেই ক্রিকেট জীবনের সমাপ্তি ঘটাতে হবে এটাই ছিল নির্ধারিত ভাগ্য। একথা আরও বেশি করে মনে হয় যখন রমেশ সাকসেনা, শ্যামসুন্দর মিত্র, শিবাজী বসুর মত প্রতিভাবান ব্যাটসম্যানদের কথাগুলো ভেসে ওঠে। এমনকি পঙ্কজ রায়ের মত ভারতের এক সেরা ব্যাটসম্যানকে পর্যন্ত টেস্ট দলে স্থান পাওয়ার জন্য টানা তিন বছর (১৯৪৮-৪৯ থেকে ১৯৫১) অপেক্ষা করতে হয়েছে। ১৯৪৮ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ যখন প্রথম ভারত সফরে এসেছিল সেবারই চতুর্থ অথবা পঞ্চম টেস্টে পঙ্কজ রায় স্থান পেতে পারতেন। কলকাতায় তৃতীয় টেস্টের আগে রাজ্যপাল একাদশের পক্ষে তিনদিনের খেলায় পঙ্কজ রায় সেঞ্চুরি করেন। আর পঙ্কজ রায়কে যখন টেস্ট দল থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়, তখন তার সমসাময়িকরা খেলছেন। রানের দিক দিয়ে পঙ্কজ রায় তখন তাদের চেয়ে অনেক এগিয়ে ছিলেন। কাজেই দিলীপ দোশি টেস্ট দলে একবারও নির্বাচিত হবেন না এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

দিলীপ দোশি কিন্তু নির্ধারিত ভাগ্যকে জয় করার জন্য ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে বসে থাকেননি। সাসেক্স ও ল্যাঙ্কাশায়ারের পক্ষে (দ্বিতীয় দলে) ১৯৭১ ও ১৯৭২ সালে খেললেন। এরপর ১৯৭৪, ১৯৭৭ ও ১৯৭৮ সালে কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে নটিংহ্যামশায়ারের পক্ষে খেলেছেন। ১৯৭৪ সালে নটিংহ্যামশায়ারের পক্ষে খেলার সময় দলের অধিনায়ক ছিলেন গারফিল্ড সোবার্স। তবে খেলার বিশেষ সুযোগ পাননি। দিলীপ এসব ব্যাপারে গোপন করা ভালবাসেন না। সব কথাই খুলে বলতে চান। তবে ১৯৭৬ ও ১৯৭৮ সালে দিলীপ খুবই ভাল করলেন ইংলিশ কাউন্টি ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নশিপে। ১৯৭৯ সালে যখন দিলীপ মাইনর কাউন্টি নর্দাম্বারল্যাণ্ডের পক্ষে খেলছেন, তখন ভারতীয় দল ইংল্যাণ্ড সফর শুরু করছে। ত্রয়ী স্পিনারের বিকল্পের কথা নির্বাচকদের মনে তখনও স্থান পাচ্ছে না।

তবে দিলীপের টেস্ট দলে নির্বাচন ও প্রবেশের ঘটনা রীতিমত নাটকীয়। ইংল্যাণ্ডে থাকতেই দিলীপ দোশিকে দলে নেওয়া হল। প্রয়ালের ভোগান্তিতে দিলীপকে হয়নি। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে মাদ্রাজে পড়তে প্রথম টেস্টে দিলীপের নাম যখন এগারোজনের মধ্যে রয়েছে, জানা গেল, তখন তার বয়স বত্রিশ ছুঁই ছুঁই। এখানেই সদ্য প্রয়াত সুঁটে ব্যানার্জির কথা মনে পড়ে যায়। সুঁটে ব্যানার্জির জীবনে প্রথম টেস্ট খেলা ও প্রথম শ্রেণী থেকে বিদায় গ্রহণ একই সঙ্গে হয়েছে, ৩৬ বছর বয়সে। ৩৬ বছর বয়সের পেস বোলার সুঁটে ব্যানার্জির টেস্ট খেলা একদিক দিয়ে ক্রিকেট ইতিহাসে এক বিচিত্র ঘটনা। এখানেও সেই নির্বাচকদের দৃষ্টিহীনদের মত আচরণ। ভারতের ক্রিকেট নিয়ে গুলে খেয়েছেন এরকম এক রসিক ব্যক্তি এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন, নির্বাচকমণ্ডলী সব সময়েই ভদ্রলোকদের দিয়ে গঠন করা হয়, তারা সকলেই এক সময়ে টেস্ট ক্রিকেটার, ভাল ক্রিকেটার ছিলেন। কিন্তু মুস্কিল হল কি ঠিক সময় তাদের ঠিক ঠিক নাম মনে পড়ে না। কারণ মনে করিয়ে দেওয়ার মত লোক না থাকলে নির্বাচকদের কিছুই মনে থাকে না। তবে একবার মনে পড়ে গেলে আর রেহাই নেই। প্রতিবারই তার নাম মনে পড়ে যাবে। তা সে খেলোয়াড়দের হয়ত তখন দাঁত পড়তে শুরু করেছে, চুলে পাক ধরেছে। দিলীপ দোশি এদিক দিয়ে কিছুটা ভাগ্যবান। কারণ রঞ্জি ট্রফিতে দু'শর ওপর উইকেট নেওয়ার পর তার নাম মনে পড়ল। দিলীপ দোশি অবশ্য তাদের নিরাশ করেননি। অস্ট্রেলিয়া ও পাকিস্তানের বিপক্ষে টানা এগারোটি টেস্ট খেললেন দিলীপ দোশি এবং ৪৫টি উইকেট পেয়েছেন। পর পর দুটি সিরিজে এই রেকর্ড নিশ্চয়ই মনে রাখার মত। তবুও দিলীপ মাদ্রাজে প্রথম টেস্ট খেলায় আটটি উইকেট দেওয়ার পর একটু ঝিমিয়ে যান। পরের তিনটি টেস্টে দিলীপ মাত্র পাঁচটি উইকেট পেলেন। নির্বাচকরা হয়ত ঘুম ছেড়ে উঠে বসে ছিলেন। তবে কলকাতা টেস্টে দিলীপ আবার তাদের ঘুম পাড়িয়ে দিলেন যখন অনেক উইকেট পেলেন। আর পাকিস্তানের সঙ্গে টেস্ট খেলায় দিলীপ দোশি ব্যাটসম্যানদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করেন। ইংলিশ কাউন্টি ক্রিকেটে খেলার সময় পাকিস্তানের অনেক খেলোয়াড়ই দিলীপকে খুব কাছে থেকে দেখেছে। অবাকও হয়েছে যখন দেখত টেস্ট দলে দিলীপের নাম আসছে না। ভারতে এসেই তারা বুঝতে পারে দিলীপের হাত থেকে বল মাটিতে পড়ে কিভাবে ঘুরে যাচ্ছে, গুগলি হয়ে যাচ্ছে।

দিলীপ দোশি যে প্রকাশ পোদ্দার হয়ে যাননি এটাই ভাগ্যের কথা। দিলীপের মনোবল সুঁটে ব্যানার্জির মতই। প্রশ্ন উঠতে পারে দিলীপ দোশিকে নির্বাচকমণ্ডলীতে পূর্বাঞ্চলের প্রতিনিধি কখনও সমর্থন জানিয়েছিলেন কিনা? এ প্রশ্ন সকলেই করতে পারেন। কারণ দেখা গিয়েছে প্রসন্ন অনেকদিন আগে থেকেই টেস্ট ক্রিকেটে কিছুটা 'অনিয়মিত'।

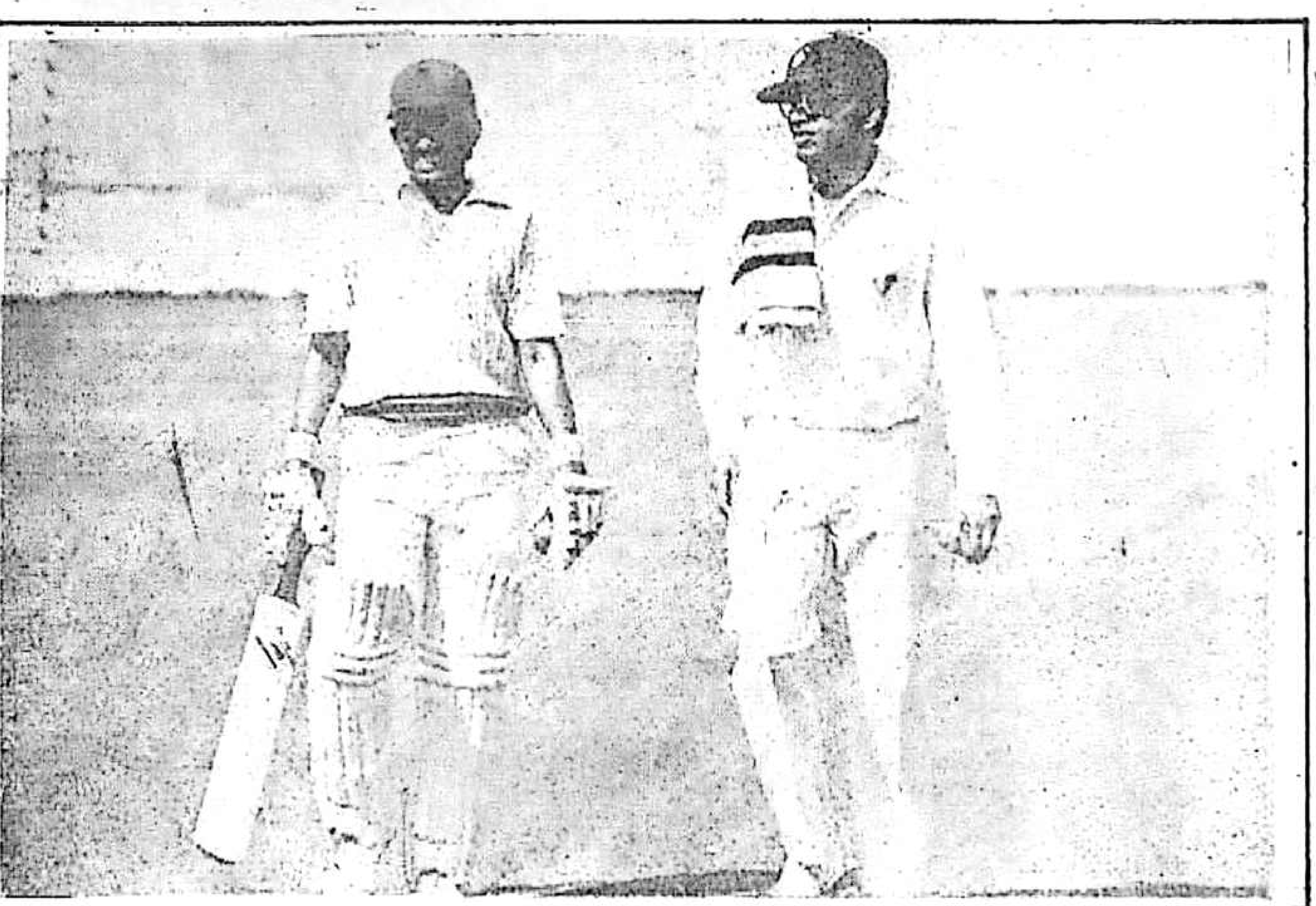
দোশিকে নিয়ে আলোচনা করতে হলে ভারতের দুই ন্যাটা বোলারের কথা এসে পড়বেই। এরমধ্যে অনবদ্য ও বিশ্বের সেরা অল রাউণ্ডার ভিনু মাঁকড়ের সঙ্গে তুলনা করা যায়, এরকম ক্রিকেটার আবার ভারত »

ধরে দেখতে পারে বলা খুব কঠিন। ব্যাটে ও বলে মাঁকড় ছিলেন এক অসাধারণ খেলোয়াড়, সর্বতো ভদ্র এক মানুষ। মাঁকড়ের বলের লেনথ নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। প্রায় প্রতিটি বলে লেনথের অদল বদল করে ব্যাটসম্যানকে সন্ত্রস্ত করে রাখার জুড়ি ছিলনা। পর পর দুটি বলে মার খেয়ে তৃতীয় বলে মাঁকড় ব্যাটসম্যানকে প্যাভিলিয়নে ফিরিয়ে দিয়েছেন এ দৃষ্টান্ত ভুরি ভুরি। ব্যাট থেকে এসেছে পরিশীলিত সব মার যা আজকের যেকোন ভারতীয় ব্যাটসম্যানকে ঈর্ষান্বিত করতে পারে। আর ফিল্ডিং-এ মাঁকড় এক নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড়।

এখানে দোশী ও বেদীর ভূমিকা অবশ্য নিষ্প্রভ। রেকর্ডের কথা উঠছে না। মাঁকড়রা জীবনের শ্রেষ্ঠ দশ বছর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্য টেস্ট খেলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। পরিসংখ্যানে মাঁকড় অবশ্যই পরাজিত। তবে পরিসংখ্যানই ক্রিকেটের সব নয়, রসিকরা একথা জানেন। ধ্রুপদী ক্রিকেট ধ্রুপদী গানের মতই কখনও মর্যাদা হারায় না।

দ্বিতীয় ন্যাটা বোলার বিষেণ সিং বেদী ৬৭টি টেস্ট ম্যাচে উইকেট পেয়েছেন ২৬৬টি। মাঁকড়ের যেখানে ৪৪টি টেস্টে ১৮৯টি উইকেট। বিষেণ সিং বেদী ২৩টি টেস্টে ভারতের অধিনায়ক ছিলেন। বোলার দলের অধিনায়ক হলে দলকে অনেক সময় ভুগতে হয়। বিষয়টি রীতিগত ঘোলাটে এবং বিষেণ সিং বেদী অধিনায়ক হিসেবে একজন বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। এর অর্থ এই নয় যে বোলার হিসেবে বিষেণ সিং বেদী সাধারণ স্তরের। বেদীর সামনে সব দেশের ব্যাটসম্যানরাই খেলতে স্বস্তি বোধ করেননি। সব সময় কি হয়, কি হয়। কারণ বেদীর নিখুঁত লেনথে বল ফেলা ছাড়া আর যেটা ব্যাটসম্যানদের চিন্তায় ফেলে দিত সেটা হল বলের ফ্লাইট ও ছোট ও বড় মাপের স্পিন। দুটি প্রায় একসঙ্গে করতেন বেদী। এক রোখা, একগুঁয়ে বিষেণ সিং বেদী মাঝে মাঝে ব্যাট নিয়ে অনেক সময় কাটিয়ে দিয়েছেন। আবার অন্যদিকে বেদী অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও সংবেদনশীল মানুষ। অধিনায়ক হলেও সব সময় দলের খেলোয়াড়দের খোঁজ রাখতেন। কেউ অসুবিধে ভোগ করছে কিনা, সে মাঠের মধ্যে অথবা বাইরে। এই প্রসঙ্গে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ঘটনা মনে রাখা উচিত। ১৯৭৬-এ ভারত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে গিয়েছে। বেদী অধিনায়ক। ব্রিজটাউনে ভারত প্রথম টেস্টে হারল। এক ইনিংসে ও ৯৭ রানে। দ্বিতীয় টেস্টে পোর্ট অব স্পেনে খেলা ড্র হয়ে গেল। যদিও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংসের ২৪১ রানের জবাবে ভারত পাঁচ উইকেটে ৪০২ রান করে দান ছেড়ে দেয়। প্রথম দিন বৃষ্টির জন্য খেলা হয়নি আর বেদী অ্যাণ্ড রবার্টস, হোল্ডিং, হলফোর্ডদের সামনে তলার দিকে ব্যাটসম্যানদের আনতে চাননি। তৃতীয় টেস্টে ভারত ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে ছয় উইকেটে হারাল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংসে চন্দ্রশেখর ছ'টি উইকেট পান। দ্বিতীয় ইনিংসে ছ'টির মধ্যে দু'টি। চতুর্থ টেস্টে ৬ উইকেটে ৩০৬ রান করার পর ডিক্লেয়ার করে দেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৩৯১ রান করে আউট। চন্দ্রশেখর পাঁচটি উইকেট পেলেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান বোলাররা ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস নষ্ট করে দেওয়ার জন্য ক্রিকেটের সব রীতিনীতি ভুলে গিয়ে উন্মাদের মতন বল ও আচরণ করতে শুরু করল। জামাইকার কিংসটন শহরের সাবিনা পার্কের দর্শক গ্যালারিতে সেদিন কলকাতার ফুটবল মাঠের মেজাজ। গায়কোয়াড়, বিশ্বনাথ বেঙ্গসরকররা দারুণভাবে আহত মাঠ হয়ে ছাড়লেন। এক মহীন্দর অমরনাথই যা কিছু করলেন। বেদী আগের টেস্টে লক্ষ্য করেছিলেন; ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ফাস্ট বোলাররা শেষের দিকের ব্যাটসম্যানদের সম্পর্কে সমান রূঢ় আচরণ করছেন বাম্পার বিমার দিয়ে। ম্যাচ এমনিতেই হার হচ্ছে। বেদী চন্দ্রশেখরকে নামতে দিলেন না। নিজেও নামলেন না। বলতে গেলে ম্যাচ ছেড়ে দিয়ে প্যাভিলিয়নে বসে রইলেন। বেদী চারটি টেস্টে ১৬টি উইকেট পেয়েছিলেন।

মাঁকড় ও বেদীর পর দিলীপ দোশি তৃতীয় ন্যাটা স্পিন বোলার। দোশির পক্ষে যেটা বলা যায় তা হল অনেক দেরীতে টেস্টে এসে দুটি সিরিজে বোলিং সাফল্য খুবই ভাল। তবে দোশি কোনদিন ভারতের অধিনায়ক হতে পারবেন কিনা বলা যায় না। আরও একটা কথা আছে। দিলীপ দোশির আগে আরও দু'জন দিলীপ ভারতের পক্ষে টেস্ট খেলেছেন এবং একজন এখনও খেলছেন। তারা হলেন দিলীপ সরদেশাই ও দিলীপ বেঙ্গসরকর।


সিডনিতে নেট প্র্যাকটিসে ব্যাট ও বল হাতে চেতন চৌহান. পাশেই দিলীপ দোশি; ছবি: পাহাড়ী রায়চৌধুরী

দিলীপ দোশির বোলিং

বল	রান	উইকেট	গড়	সর্বোচ্চ
৩৩৬০	১১৩৪	৪৫	২৫.২০	৬/১০৩

ব্যাটিং

টেস্ট	ইনিংস	নঃ আঃ	রান	সর্বোচ্চ	সেঞ্চুরি	হাঃ সেঞ্চুরি	গড়
১২	১২	১	৬১	২০	০	০	৫.৫৫

অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড সফরে ভারত কবে, কোথায়

সুনীল গাভাসকরের নেতৃত্বে ভারতীয় ক্রিকেট দল অস্ট্রেলিয়া সফর শুরু করছে ১৬ নভেম্বর। এই সফরে ভারত অস্ট্রেলিয়া ছাড়া নিউজিল্যাণ্ড ও তাসমানিয়ায় খেলছে। অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের সঙ্গে তিনটি করে টেস্ট ম্যাচ ছাড়া থাকছে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ওয়ার্ল্ড সিরিজ কাপে একদিন করে পাঁচটি খেলা এবং একইভাবে নিউজিল্যাণ্ডের সঙ্গে পাঁচটি খেলা। অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যাণ্ডের সঙ্গেও ওয়ার্ল্ড সিরিজ কাপে পাঁচটি ম্যাচ খেলবে। তিন দলের মধ্যে যে দুটি দল বেশী সংখ্যায় ম্যাচ জিতবে তাদের মধ্যে আবার একদিনের পাঁচটি খেলা হবে। এছাড়া পার্থে ওয়েস্ট অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট অস্ট্রেলিয়া ক্রস কান্ট্রির সঙ্গে অ্যাডিলেডে সাউথ অস্ট্রেলিয়া, সাউথ অস্ট্রেলিয়া কান্ট্রির সঙ্গে, কুইন্সল্যাণ্ড এবং ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে খেলবে।

নিউজিল্যাণ্ডে টেস্টের আগে ভারত খেলবে অকল্যাণ্ডে, হ্যামিলটনে, নেপিয়ারে এবং দুনেদিনে। অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে তিনটি টেস্ট হবে সিডনী, অ্যাডিলেড ও মেলবোর্নে। নিউজিল্যাণ্ডের সঙ্গে ওয়েলিংটন, ক্রাইস্ট চার্চ অকল্যাণ্ডে ভারত টেস্ট খেলবে।

এই সফরে টেস্ট সমেত ভারতের মোট ম্যাচের সংখ্যা আর ওয়ার্ল্ড সিরিজ কাপে চব্বিশটি। প্রথম রাউণ্ডে জিততে পারলে ভারতকে আরও পাঁচটি একদিনের ম্যাচ খেলতে হতে পারে। দিন হিসেব করলে ভারতীয় ক্রিকেট দলকে ৭৩ দিন ক্রিকেট মাঠে নামতে হবে। আর ওয়ার্ল্ড সিরিজ কাপে ফাইনাল রাউণ্ডের ম্যাচ ধরলে ওই সংখ্যা ৭৮-এ দাঁড়াতে পারে।

উল্লেখযোগ্য খেলার তালিকা: নভেম্বর ২২-২৫ পার্থে ওয়েস্ট অস্ট্রেলিয়া, ২৯ নভেম্বর-২ ডিসেম্বর অ্যাডিলেডে সাউথ অস্ট্রেলিয়া, ১১-১৩ ডিসেম্বর হোবার্টে তাসমানিয়া, ২৬-২৯ ডিসেম্বর ব্রিসবেনে কুইন্সল্যাণ্ড, ২-৬ জানুয়ারি সিডনীতে **অস্ট্রেলিয়া-ভারত প্রথম টেস্ট,** ২০-২১ জানুয়ারি ক্যানবেরায় ভিক্টোরিয়া, ২৩-২৭ **জানুয়ারি অ্যাডিলেডে ভারত-অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় টেস্ট, ৭-১১ ফেব্রুয়ারি মেলবোর্নে অস্ট্রেলিয়া-ভারত তৃতীয় টেস্ট,** ১৭-১৯ ফেব্রুয়ারি নেপিয়ারে নিউজিল্যাণ্ড সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্ট, ২১-২৬ ফেব্রুয়ারি ওয়েলিংটনে **ভারত-নিউজিল্যাণ্ড প্রথম টেস্ট,** ২৮ ফেব্রুয়ারি-২ মার্চ ডুনেডিনে ও টাগো একাদশ, ৬-১১ মার্চ **ক্রাইস্টচার্চে ভারত-নিউজিল্যাণ্ড দ্বিতীয় টেস্ট, ১৩-১৮ মার্চ অকল্যাণ্ডে নিউজিল্যাণ্ড-ভারত তৃতীয় টেস্ট।**

যারা ছবি পাঠান

খবরের সঙ্গে বা আলাদাভাবে যারা ছবি পাঠান, তাদের কাছে অনুরোধ—ছবিগুলি যেন অন্তত হাফ সাইজ হয়। কেবল কারোর শুধু মুখ পাঠালে তা কোয়ার্টার সাইজ পাঠাবেন। গ্লসি পেপারে প্রিন্টই বাঞ্ছনীয়। তা না হলে অফসেটে ভাল ছাপা যায় না।

—সম্পাদক



ব্রজদা



অশোক চট্টোপাধ্যায়

(দুই)

রবীন্দ্রন্যথ বসে আছেন, শান্ত সৌম্য চেহারা। ব্রজদা গিয়ে সামনে দাঁড়ালেন, কবি মৃদু হাসলেন মাত্র। 'এতবড় এক ব্যক্তিত্বের সামনে দাঁড়িয়ে ব্রজদার মত ডাকাবুকো লোকের বুকও কোন্ এক অজ্ঞাত কারণে বাঁশপাতার মত তিরতির করে কাঁপতে লাগল। কিন্তু এটা নিতান্তই সাময়িক, ব্রজদা মনের উত্তেজনা, বিহ্বলতা কাটিয়ে নিবেদন করলেন, 'গুরুদেব, আমি আপনার সাহায্য চাই।'

এমন সাহায্যপ্রার্থী কবির কাছে প্রতিনিয়তই আসে। রবীন্দ্রনাথ তাই বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে ব্রজদার দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকালেন মাত্র। ব্রজদা বললেন, 'আমাকে আনন্দবাজার পত্রিকার স্পোর্টস এডিটরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সংশয়টা আমার এই নতুন পদ নিয়েই। খেলাধূলা নিয়েই বাংলায় বিস্তারিতভাবে এখনো পর্যন্ত কেউ লেখেননি। পরিভাষার সমস্যা আছে, প্রকাশভঙ্গী কি হবে, তাও আমার সঠিক জানা নেই। সাহেবরা তাদের কাগজে বেশ ফলাও করে লেখে বটে, ইংরেজিতে সেরকম আমিও লিখতে পারি, কিন্তু বাংলায়...'।

সমস্যাটা তখন গুরুদেবকেও স্পর্শ করেছে। বললেন, 'খেলাধূলা তো খুবই ভাল জিনিস। প্রত্যেক ছেলেমেয়ের খেলাধূলার মাধ্যমে শরীর আর চরিত্র গঠনের ওপর আমি জোর দিই। আমাদের আগ্রহে সেভাবে খেলার ব্যবস্থা চালুও করেছি। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে আমি খেলাধূলার সঙ্গে ততটা জড়িত নই যে বাংলায় স্পোর্টস রিপোর্টিং কেমন হবে সে ব্যাপারে তোমাকে পরামর্শ দেব।' তারপর একটু হেসে বললেন, 'যুযুৎসু দেখে ভারী ভাল লেগেছিল তাই তাগাকাকিকে আশ্রমে আহ্বান করে এনেছি মারপ্যাঁচগুলো শিখিয়ে দেবার জন্য।'

ব্রজদা তখনো বিপন্ন মুখে দাঁড়িয়ে আছেন দেখে রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'এখন আর ভয় পাচ্ছো কেন? তুমি যা ভাল বুঝবে, যেমনভাবে লিখবে সেটাই বাংলায় ক্রীড়া সাংবাদিকতার পথ প্রদর্শক হবে। সংশয় দূর করে কাজে লেগে পড়।'

রবীন্দ্রনাথের কাছে পরামর্শ নিয়ে যাওয়ার ঘটনাটা ব্রজদার নিজের মুখ থেকে শুনেছি। এ সম্পর্কে আরেকটি কাহিনী শুনেছি এক প্রবীণ সাংবাদিকের মুখে। তারও নাকি ব্রজদার কাছ থেকে শোনা, ক্রীড়া সাংবাদিকের দায়িত্ব পাওয়ার পর বিপন্ন ব্রজদা ধ্যানে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে স্মরণ করলেন। মানসপটে রামকৃষ্ণদেবের জ্যোতির্ময় মূর্তি ফুটে উঠল। ব্রজদা বললেন, 'ঠাকুর এ কঠিন দায়িত্ব আমি কিভাবে পালন করব?' 'ঠাকুর বরাভয় মুদ্রা দেখিয়ে স্মিতহাস্য করলেন, ভয় কিরে ব্যাটা! তুই খেলার খবর যা লিখবি, তাই ক্রীড়া সাংবাদিকতা। যা বুঝবি তাই লিখবি, যা না বুঝবি তাও লিখবি। যত কম জানবি তত বেশি লিখবি, দেখবি তোকে নিয়ে ধন্য ধন্য পড়ে গেছে। আর আমার আশীর্বাদ বাংলা ক্রীড়া সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এই ঐতিহ্যই বজায় থাকবে।'

এটা যে নেহাতই গপ্পো তাতে সন্দেহ কি? গপ্পের মধ্যে ক্রীড়া সাংবাদিকতা নিয়ে যে শ্লেষটুকু আছে, সেটা ব্রজদার মত যোগ্য সাংবাদিককে কখনই স্পর্শ করে না। আসলে ব্রজদা যেহেতু পথপ্রদর্শক, সে কারণে গপ্পটা তাকে নিয়েই তৈরি হয়েছে।

আজ থেকে বছর ষাটেক আগে বাংলা সংবাদপত্রে খেলার খবর কেমন প্রকাশিত হত। আনন্দবাজার পত্রিকায় দ্বিতীয় ডিভিসন লিগের দুটি খেলার বিবরণ ছাপা হয়েছিল:

ইস্ট বেঙ্গল—৩ পুলিশ—০

পুলিশ গ্রাউণ্ডে এই উভয় দলের মধ্যে খেলা হইয়া গিয়াছে। খেলাটা বরাবরই নিতান্ত একঘেয়ে রকম হইয়াছিল। কারণ ইস্ট বেঙ্গল, পুলিশ টিম অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। এস রায় দুইটি গোল দিয়াছিলেন, একটা গোলে তিনি খুব বাহাদুরী দেখাইয়াছেন, প্রায় ২৫ গজ দূর হইতে সুন্দর একটি সটে গোল হইয়া গিয়াছে।

অপর একটি খেলার বিবরণ:

মোহন বাগান—(০) ক্যালকাটা—(১)

শনিবার দিন মোট ৪টি খেলা হইয়া গিয়াছে। মোহন বাগান ও ক্যালকাটা ক্লাবের মধ্যে যে খেলা হয়, উহা দেখিবার জন্য বহুসংখ্যক উপস্থিত হইয়াছিল। উভয় দলই খুব ভাল খেলিয়াছে। দুর্ভাগ্যবশত মোহন বাগান ১ গোলে হারিয়া গিয়াছে। রেফারি বেনেটের পক্ষপাতিত্বে বাঙালী দলকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। বাঙালীরা কাহারও গায়ে লাগিলেই ফাউল আর গোল দেওয়ার সম্ভাবনা থাকিলেই অফসাইড। খেলার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ রেফারি কেন দেওয়া হইতেছে না? আর রেফারিটিও দেখিতেছি শ্বেতাঙ্গদিগেরই একচেটিয়া। ভারতীয়দের মধ্যে রেফারি করিবার উপযুক্ত লোক খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না?

এসব খবর ছাপা হত ব্রজদা আনন্দ বাজারে যোগ দেবার অনেক আগে। ব্রজদা পাকাপাকিভাবে আনন্দ বাজারে যোগ দিলেন ১৯৩২-এ, 'মাইনের কথা শুনলে তোমরা এখন হাসবে, মাত্র পঁয়তাল্লিশ টাকা। এর বছর দুয়েক বাদে আমি যখন বিয়ে করি তখন মাইনে পাই একশো দশ টাকা। ওই একভাবে চলে যেত।'

ব্রজদা আনন্দবাজারে স্পোর্টস এডিটর হিসাবে নিযুক্ত হলেন কিন্তু অফিস তাকে অচিরেই 'সকল কাজের কাজী' বা 'হরফন মৌলা' বানিয়ে তুললেন। 'জ্যাক অব অল ট্রেডস'-এর কথাটা এক্ষেত্রে মানানসই হত না। কারণ, ব্রজদা সব কাজেই মাস্টার ডিগ্রি পাবার যোগ্যতা ধরেন।

আনন্দবাজারের বর্মন স্ট্রিটের অফিসে একসময় তিন জনের মাত্র নেম প্লেট ছিল, তারমধ্যে ব্রজরঞ্জন রায় অন্যতম। শুধু মাঠে মাঠে ঘুরে ঘুরে খেলার রিপোর্ট করাই নয়, আরো দশ রকম খবর, ইংরেজিতে পাঠানো নিউজ এজেন্সির খবরের অনুবাদ ইত্যাদি সম্পাদকীয় বিভাগের কাজত ছিলই সঙ্গে আরো অনেক কিছু। 'ব্রজ! তোমার তো বাংলার গ্রামে গ্রামে বেশ যাতায়াত আছে। দেখোনা ওসব জায়গায় নতুন নতুন এজেন্সি দেওয়া যায় কিনা?' ব্রজদা ঘুরে ঘুরে জেল খাটা, স্বদেশী করা আদর্শবান বন্ধুদের খুঁজে খুঁজে বার করতেন। তাদের ওপর রাজরোষ থাকায় তাদের চাকরি পাওয়াটা মুশকিল ছিল। ব্রজদা সে সব বন্ধুদের এজেন্সি নেবার পরামর্শ দিতে লাগলেন।

এরপর ১৯৩৪ সালের ঘটনা। বিহারের মুঙ্গেরে এক প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্প হল। প্রফুল্ল সরকার ব্রজদাকে ডেকে বললেন, 'মুঙ্গেরে যাওয়ার জন্য একজন খুব সাহসী লোক দরকার। এব্যাপারে তোমার ছাড়া আর কার নাম ভাবতে পারি?'

আঠাশ বছরের যুবক ব্রজরঞ্জন রায় স্বেচ্ছায় এক ঝুঁকি নিলেন। তারপরের ঘটনা কোন কোন ক্ষেত্র অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাসের মত রোমাঞ্চকর।

(চলবে)



স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকে ব্রজদা কারাবরণ করেছেন একাধিক বার। ১৯৩১ সালে জেল থেকে বেরোবার পরে ব্রজদা

জীবন সুঁটে ব্যানার্জিকে ফাঁকি দিতে চেয়েও পারেনি

বিশ্বজিৎ রায়

ভালো নামে তাকে সাধারণ ক্রিকেট-মোদীরা কোনদিনই জানতেন না। প্রথম দিকে ছিলেন এস ব্যানার্জি এবং পরের দিকে অর্থাৎ যখন থেকে রেডিও-তে ক্রিকেট ভাষ্যকারদের মুখে তার উল্লেখ শোনা যেতে লাগল, সেই ভারতে প্রথম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল খেলার সময় থেকে—তিনি পাকাপাকি ভাবেই পরিচিত হলেন সুঁটে ব্যানার্জি হিসেবে। বাঙলার বাইরে তাকে ঠিক কী চোখে দেখা হতো জানি না। সি কে নাইডু প্রায় চল্লিশ বছর আগে কলকাতায় বলেছিলেন, সঙ্কটের মুখে ব্যাটিং-এর ভাঙন রোধ করতে তিনি যখনই সুঁটে ব্যানার্জিকে ব্যাট করতে পাঠিয়েছেন তখনই সুফল পেয়েছেন। ক'দিন আগে তার মৃত্যুর পর প্রফেসার দেওধর এবং বিজয় মার্চেন্ট (তার ১৯৪৬ সালে ইংল্যাণ্ডে টেস্ট খেলতে না পারা এবং ১৯৪৭ সালে অস্ট্রেলিয়া সফরকারী দলে স্থান লাভে বঞ্চিত হওয়ার জন্য এদের দু'জনের দায়িত্ব কম ছিল না) অবশ্য সুঁটে ব্যানার্জির ব্যাটিং এবং বোলিং-এর পরাক্রম সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসামূলক মন্তব্য করেছিলেন। সে যাই হোক, চল্লিশ বছর আগে কিশোর বাঙালী ক্রিকেট উৎসাহীদের কাছে সুঁটে ব্যানার্জি ছিলেন যাকে ইংরেজিতে বলে 'হিরো'।


সুঁটে ব্যানার্জি

ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে অবশ্য নিজের দাদাকে বাদ দিলে—আরো দু'জন তৎকালীন বাঙালী খেলোয়াড় ছিলেন অত্যন্ত প্রিয়। একজন ফুটবল, হকি, ব্যাডমিন্টনে এক ঝকঝকে খেলোয়াড়—তারা ব্যানার্জি। আরেকজন ক্রিকেট এবং ফুটবলে চোখ ধাঁধাঁনো স্টাইলের অধিকারী—নির্মল চ্যাটার্জি। তবে নানান কারণে সর্বভারতীয় স্বীকৃতি এরা তেমন পাননি, যেমন পেয়েছিলেন সুঁটে ব্যানার্জি—বিশেষত ১৯৩৫ থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত। এই সময়ে ভারতে এমন সব খেলোয়াড় ছিলেন যারা ব্যক্তিত্বে এবং ক্রীড়াদক্ষতায় প্রতীয়মান হতেন অতি-মানুষ হিসেবে। বলাবাহুল্য এদের মধ্যে প্রধান ছিলেন সি কে নাইডু এবং তার পরে ওয়াজির আলি, মুসতাক আলি, অমর সিং, মহম্মদ নিসার, বিজয় মার্চেন্ট, অমরনাথ প্রমুখ। এমন মহাবীরদের মধ্যেও সুঁটে ব্যানার্জির একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। লর্ড টেনিসনের দলের বিরুদ্ধে যে বেসরকারী পাঁচটি টেস্ট হয়, তার দু'টিতে জিত হয় ভারতীয় দলের। ওই দুই খেলায় যদিও সুঁটে ব্যানার্জির প্রতিভা খুব স্পষ্ট ভাবে ফুটে ওঠেনি, তবুও লর্ড টেনিসনের দলের অন্যতম সদস্য নরম্যান ইয়ার্ডলি (পরবর্তী কালে টেনি ইয়র্কশায়ার এবং ইংল্যাণ্ড দলের ক্যাপ্টেন হয়েছিলেন) লিখেছিলেন : 'নো ওয়ান নিডস এক্সকিউজ ফর বিইং বিটন বাই সাচ প্লেয়ারস অ্যাজ মার্চেন্ট, অমরনাথ, হিনডলেকর, জয়, অমর সিং, হাজারে, মাণিক দে, ব্যানার্জি অ্যাণ্ড আদারস'।

লর্ড টেনিসনের দল ভারতে আসার আগেই ভারতীয় দল ইংল্যাণ্ডে খেলতে যায় ভিজিয়ানাগ্রামের কুমারের নেতৃত্বে। সেবার সুঁটে ব্যানার্জির টেস্ট ক্যাপ লাভ হয়নি। তার কারণ সম্ভবত এই নয় যে ভিজি তার খেলায় সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। খেলার মান বিচার করে ভারতীয় দল অন্তত সেবার বাছাই করা হয়নি। একজন যে সি কে নাইডুকে সকলের সামনে অপমান করার জন্য স্যার ভিজির সমর্থনে টেস্ট দলে প্রবেশের সম্মান পেয়েছিলেন, তার লিখিত বিবরণ আছে। সত্য হোক বা না হোক সুঁটে ব্যানার্জি ছিলেন সি কে-র কাছের লোক বলে পরিচিত। 'সুতরাং তার প্রতি ভিজি ব্রিটন জোনস চক্র খুব সদয় ছিলেন না। অথচ প্রথমবার বিদেশে গিয়ে ইংল্যাণ্ডের পিচের সঙ্গে পরিচয় লাভের উপযুক্ত সংখ্যক খেলার সুযোগ না পেয়েও সুঁটে ব্যানার্জি নেহাৎ খারাপ খেলেননি। তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল ডারহামের বিরুদ্ধে খেলায়। ১৯৩৬-এর আগেই অবশ্য তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

সুঁটে ব্যানার্জি বঞ্চিত হল কেন? এর উত্তর খুবই সহজ। যে সময়ে এবং যাদের সঙ্গে খেলতেন সেই সময় এবং সেই খেলোয়াড়রা ভারতীয় রাজন্যবর্গদের প্রভাবে আচ্ছন্ন ছিল। তিনি নিজেও বহুদিন খেলেছেন নওনগরের হয়ে। দ্রুত বল করা, আক্রমণাত্মক ব্যাট করে তড়িৎগতিতে রান তোলা এবং বিশেষ করে ক্রিকেট শাস্ত্রকে অনেক সময়েই অবহেলা করে নতুন মার রচনা করা—এইসব রোমান্টিকতা ক্রিকেটের সেই সামন্ততান্ত্রিক আবহাওয়ায় প্রচলিত ছিল। এই ধাঁচের খেলার ধারার প্রতিনিধি ছিলেন সি কে নাইডু, ওয়াজির আলি থেকে অমরনাথ, সুঁটে ব্যানার্জি প্রমুখ। বিজয় মার্চেন্ট, বিজয় হাজারে প্রমুখ যে মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির কেন্দ্র বম্বের আধুনিক ক্রীড়াভঙ্গী চল্লিশের দশক থেকে প্রবর্তন করলেন তা খেলার ফল-এ খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত রেকর্ডের অনেক উন্নতি করল, কিন্তু ক্রিকেট খেলার কৌলিন্যকে মুছে দিল। পূর্ববর্তী ঢং-এর খেলোয়াড়রা তাই কিশোর কল্পনাকে অধিকার করতে পারতেন অনেক বেশি।

পনেরো গজ দূর থেকে দীর্ঘকায় বৃষস্কন্দ বোলার দৌড়তে শুরু করলেন। বলশুদ্ধ ডান হাত অনেকটা বক দেখানোর ভঙ্গীতে কিন্তু অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে উঠল আর পড়ল তিনবার। তারপর ক্রিজের কাছে এসে দুই হাত উঠল মাথার কাছে আর দেহ মাটির থেকে অনেকটা ওপরে লাফ দিল এক সার্বিক ছন্দকে প্রকাশ করে, এবং প্রচণ্ড তেজে বলকে নিক্ষেপ করে পড়ল পপিং ক্রিজের বাঁ দিকে। এই দৃশ্য যে কিশোর দৃষ্টিকে মুগ্ধ করবে তাতে সন্দেহ কি। শুধু কি ওইরকম জোর বলই তিনি দিতেন? ব্যাটিং—এইবা কী কম? ওপেনারের দরকার? সুঁটে নামলেন ইনিংসের প্রারম্ভে। কলকাতায় খেলা হচ্ছে গভর্ণরের একাদশ আর ভাইসরয়ের একাদশ। গভর্ণর্স একাদশের ব্যাটিং-এর মাঝামাঝিতে ভাঙন দেখা গেল। সুঁটে নামলেন এবং ষাটের ওপরে রান করে সেই ভাঙন রোধ করলেন। অর্থাৎ তিনি ছিলেন সেই ধরনের ক্রিকেটার যা সব বালক হতে চায়।

দূর থেকে যাকে দেখে মোহিত হয়েছি কাছে এসে তার প্রতি শ্রদ্ধা আরো বেড়েছিল। খেলোয়াড় বলেই যে জীবনের বিভিন্ন সুকুমার দিকগুলির প্রতি অনাগ্রহী এবং অজ্ঞ থাকতে হবে সুঁটে ব্যানার্জি তা মনে করতেন না। ভিলাই কারখানার পাবলিক রিলেশনস-এর ভারপ্রাপ্ত কর্মী হিসেবে একদা তিনি মস্কো গিয়েছিলেন। কবি সমর সেনের গৃহে তিনি অনেক সন্ধ্যা কাটাতেন। তখন প্রকাশ পেত তার সংস্কৃতি-মনের পরিচয়। ভারতীয় ক্রিকেটের কর্তারা কেন তার প্রতি এত অবিচার করলেন সে বিষয়ে তিনি কোন রকম মন্তব্য করাটা অশোভন জ্ঞান করতেন। কোন অবকাশ পেলেই গীতবিতান খুলে ফরমাস করতেন সেইসব গানের যাদের সম্বন্ধে সাধারণ শ্রোতাদের মধ্যে সচেতনতা খুব ব্যাপক নয়। ১৯৭৯ সালের গোড়ায় ভেটারেন্স ক্রিকেট দলের পুরোধা হয়ে তিনি ও কার্তিক বসু গিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে খেলতে। সেখানেও তিনি যেমন খেলোয়াড় হিসেবে—৬৬ বছর বয়সে বারো ওভার বল করা খুব সহজ ব্যাপার নয়—তেমনি মার্জিত ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল পরিচয় দেন। সেখানে 'ওগো দখিন হাওয়া' এবং 'তুমি কোন্ পথে যে এলে পথিক' নিজেও গুণগুণ করে সুর মিলিয়েছিলেন। বোঝা গিয়েছিল যে জীবন তাকে নানা ভাবে ফাঁকি দিতে চেয়েছিল কিন্তু পারেনি।


১৯৩৬ সালের চতুর্দলীয় টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন 'হিন্দু' দল। ডানদিকে চেয়ারে বসে সুঁটে ব্যানার্জি

সুঁটে ব্যানার্জির স্মরণীয় ম্যাচ

প্রশান্ত ভট্টাচার্য

আপনার সেরা ম্যাচ কোনটি ? এ প্রশ্ন করেছিলাম সুঁটে ব্যানার্জিকে বছর দশেক আগে। তখন তিনি সবে ভিলাই থেকে এসেছেন কলকাতায় পাকাপাকিভাবে থাকবেন বলে। সেখানে থাকতেই নিউমোনিয়া হয়েছিল, আর এখানে এসেই হার্টের অসুখে পড়লেন। ডাক্তার সাবধান করে দিলেন বেশি দৌড় ঝাঁপ কিন্তু চলবে না। তাই আর কি করেন, খুব ভোরে ভোরে দেশবন্ধু পার্কে আসতেন মর্নিং ওয়াক সারতে। আর এইখানেই তিনি আমাদের সঙ্গে গপ্পে মেতে উঠতেন। সেই সুবাদেই জেনে নিয়েছিলাম সুঁটে ব্যানার্জির সেরা ম্যাচ কোনটি।

ছেচল্লিশ বছর আগে এখনকার এরিয়ান ক্লাবে খেলতেন। বাংলার হয়ে রঞ্জি ট্রফি খেলেন দু'বছর (১৯৩৭-৩৮)। খেয়াল খুশীর মানুষ। হঠাৎ নওনগরে গিয়ে উঠলেন। তাদের হয়েই খেললেন রঞ্জি ট্রফি, বোম্বাইয়ের বিরুদ্ধে। রান করলেন ১২৬।

আগে লেখাপড়া, পরীক্ষা—তারপর খেলা। বাবার চিঠি পেয়ে সুঁটে ব্যানার্জির খেলার নেশা ছুটল। ফিরলেন কলকাতায়। পরীক্ষা শেষে টাটায় গেলেন চাকরি নিয়ে। বিহারের হয়ে রঞ্জি ট্রফি খেললেন একটানা ১৬ বছর। তারপরে ভিলাই। বুড়ো বয়সে নতুন কাজ নিলেন। বন্ধুদের উপরোধে ঢেঁকি গেলার মত আর একবার রঞ্জি ট্রফি খেললেন মধ্যপ্রদেশের হয়ে বিদর্ভের বিরুদ্ধে।

৩৬-এর ইংল্যাণ্ড সফরের কথা না হয় বাদই দিলাম। কিন্তু ৪৬-এ ? হ্যাঁ, দু' বারই টেস্ট ম্যাচে সুঁটে ব্যানার্জির জায়গা হয়নি। সে কথা অনেকেই জানেন। তাইতো সুঁটেদাও শুনে মাথা নাড়লেন। 'একি অভিসম্পাত না অবিচার ?' তাতেও তিনি রা কাটলেন না। তবে মুহূর্তে তার ডান হাতের মুঠি শক্ত হয়ে গিয়েছিল।

সে কথা থাক। কথার মোড় ফেরালাম। বললাম : আপনার জীবনের সেরা ইনিংস কোনটি ? বৃদ্ধের কোন সাড়া পেলাম না। তাই একে একে তার স্মরণীয় খেলাগুলি তুলে ধরলাম তার স্মৃতিপটে। '৪৬-এর ইংল্যাণ্ড সফরে ওভাল মাঠে সারের বিরুদ্ধে আপনার ১২১ রান, যেটা, শেষ উইকেটের জুটি সর্বাতের (১২৪) সঙ্গে ২৪৯ রানের রেকর্ড আজও অম্লান হয়ে আছে। মাথা নাড়লেন সুঁটে ব্যানার্জি। তেমন দাগ কাটার মত নয়। আগ্রহভরে বললাম : দু'বছর বেসরকারী টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন। প্রথমটি লর্ড টেনিশনের নেতৃত্বে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে, অপরটি অস্ট্রেলিয়ার। অর্থাৎ জ্যাক রাইডারের দলের বিরুদ্ধে—তাও নয়। তাহলে ? অবাক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম সুঁটে ব্যানার্জির দিকে। এবার চোখ নাচিয়ে উৎসাহভরে বললাম : অবশ্যই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে। এলাহাবাদে ইস্ট জোনের হয়ে খেলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের আটটি উইকেট দখল করা কম কথা নয়। তাও ছত্রিশ বছর বয়সে। বোম্বাইয়ের একমাত্র সরকারী টেস্ট ম্যাচে যেটা খেললেন ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে আপনার ৪টি উইকেট পাওয়া গৌরবের কথা। না ওটাও নয়। তবে আছে। মুচকি হাসলেন। সে খেলাটা আজও ভুলতে পারিনি।

পেন্টাঙ্গুলার ম্যাচ। ৩৯ সালের কথা। হিন্দু-মুস্লিমের ফাইনাল ম্যাচ। খেলা বোম্বাইয়ের ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামে। মুস্লিম দল আগে ব্যাট করে। রান করে ১৯৯। সি এস নাইডু ৭৮ রানে ৭টি উইকেট পান। কিন্তু হিন্দু দল ১৫৯ রানেই আউট হয়ে গেল। ফাস্ট বোলার মহম্মদ নিসারই হিন্দু দলকে কাৎ করলেন (৫০-৬)। এবার মুস্লিম দল খেলা গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত। প্রথম ব্যাটসম্যান মুস্তাক আলি ৩ রানে সুঁটে ব্যানার্জির বলে বোল্ড হলেও এম এম কাদরি ভালই খেললেন। আউট হলেন ৩৩ রানে অমর সিংয়ের বলে। এবার বেশ জুটি বাঁধলেন দিলওয়ার হোসেন আর মুস্লিম দলের অধিনায়ক ওয়াজীর আলি। সি এস নাইডুকে এবার তারা পাত্তা দিলেন না। একে ৪৩ রানে হিন্দু দল পিছিয়ে তার ওপর এদের দু'জনের জোট বাঁধা খেলায় গোটা হিন্দু দলের মুখ শুকিয়ে উঠলো। হিন্দু অধিনায়কের তখন মাথায় হাত। হাল ছেড়ে দিয়েছেন বলতে গেলে। এ হেন অবস্থায় সুঁটে ব্যানার্জি অধিনায়ক সি কে নাইডুর কাছে আবদার ধরলেন : ভাইসাব, আমায় একবার বল করতে দিন না। একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি। সি কে হাসলেন। বিদ্রূপভরে বললেন : হ্যাঁ সবাই সব করলো, তুমিই এখন বাকি। বল তো আগে কম করোনি। বলটা সুঁটের হাতে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন : দ্যাখো ম্যাচতো হাত ছাড়া। রগ চটা মানুষ সুঁটে ব্যানার্জি দারুণ ক্ষেপে উঠলেন। প্রথম বলেই বাম্পার। আরে বাপস্, বেমক্কা মাথায় ঘা খেয়ে দিলওয়ার হোসেন বসে পড়লেন। ওয়াজীর আলির মাথায় বাজ পড়লো। এমন কি লেগেছে যে মাঠে দাঁড়ানো যায় না। ওয়াজীরের কোন অনুরোধ না শুনেই দিলওয়ার মাঠ ছাড়লেন মাথায় হাত দিয়ে। ওয়াজীর ভেঙ্গে পড়লেন। আচমকা রান আউট হলেন। খেলার মোড় ঘুরলো। সুঁটে ব্যানার্জি বেশ বাগিয়ে জাহাঙ্গীর খাঁ ও সৈয়দ আমেদকে শূন্য রানে ফিরিয়ে দিলেন। আব্বাস খাঁ রুখে দাঁড়াতে গেলেন (১০), কিন্তু পারলেন না। আউট হলেন সুঁটে ব্যানার্জির বলে। ১৮০ রানে সবাই আউট। সুঁটে ব্যানার্জি ৫৭ রানে ৪টি উইকেট পেলেন। এরপর হিন্দু দল খেলা দেখালেন বটে। ভিনু মানকড় ও বিজয় মার্চেন্টের ব্যাটিংয়ের দৃঢ়তায় হিন্দু দলের ম্যাচ জিত হল। রান হলো ৫ উইকেটে ২২১। সবচেয়ে বেশি রান বিজয় মার্চেন্টের (৮৮ নট আউট) মানকড়ের রান ৭৩।

অনেকেই বলেন লাহোর মুস্লিম পাঞ্জাবীদের মধ্যে ফাস্ট বোলিংয়ের মহড়া চলতো বেশি। তাই সেকালে ফাস্ট বোলারের কোন অভাব ছিল না।

কই, একমাত্র মহম্মদ নিসার ছাড়া আর কারুর নামতো মনে পড়ছে না। ফাস্ট বোলিংয়ের একটা স্বতন্ত্র রীতিনীতি আছে। দশাসই চেহারা হলেই কি সব সমস্যা মিটবে ? রমাকান্ত দেশাই কি মোটাসোটা ছিলেন ? সহজ উপায় দেখাও। উইকেট-গুলো প্রাণবন্ত করে তোল। দেখবে সবাই ছুটবে ফাস্ট বোলিং করতে। আজকের যা মাঠ। হরিবল। হাতের নড়া ছিঁড়বে।

বেলা বেড়েছে। চড়া রোদ। আর কথা না বলে উঠে পড়লেন সুঁটে ব্যানার্জি। ধীরে ধীরে চলা অভ্যাস করছেন। হার্টের অসুখ। বকবক করে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। ছাড়াছাড়ি হবার আগে একটু হেসে বললেন, আমার চেহারা কেমন ছিল জানতো !' ঠিক এই রকম। একটা আঙ্গুল নেড়ে দেখিয়ে দিলেন, ঠিক এমনি পাতলা ছিলেন।

১৯৭৩—সুঁটে ব্যানার্জি ও রাজু মুখার্জি



সুঁটেদা

শিবরাম কুমার

সুঁটেদার মত ক্রিকেটার হয়ত অনেক হবে কিন্তু সুঁটেদার মত ভদ্রলোক কিংবা অন্যায়ের কাছে আপোষহীন, উদার, পরো-পকারী, নিরহঙ্কারী মানুষ বোধহয় আর হবে না। মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে পৃথিবী থেকে যেন একটি পরম সৌন্দর্য বিলুপ্ত হল।

সুঁটেদাকে প্রথম খুব কাছ থেকে দেখে-ছিলাম গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে বেরী সর্বাধি-কারীর ঘরে। সুঁটেদা প্রায়ই আসতেন। গল্প করতেন। প্রাণখোলা হাসি হাসতেন। বেরীদার প্রয়োজনেও লাগতেন। আর সদ্য প্রয়াত সাংবাদিক রাখাল ভট্টাচার্যের বাড়িতেও আসতেন। এই দু'জনের খুব কাছাকাছি ছিলাম বলেই সুঁটেদার কাছা-কাছিও হয়ে গিয়েছিলাম অল্প সময়ের মধ্যে।

সুঁটেদা যেকোন লোককে যা সাহায্য করতেন কখনও তৃতীয় ব্যক্তি কারুর জানবার উপায় ছিল না। যদিও দ্বিতীয় ব্যক্তির মারফৎ মাঝে মাঝে তার হৃদয় প্রসারতার খবর আমি পেয়েছি।

অনেকে গাম্ভীর্যপূর্ণ এই মানুষটিকে দেখে অহঙ্কারী বা অসামাজিক মনে করেছেন। কিন্তু যারা তার কাছে আসতে পেরেছেন তারা জানেন সুঁটেদার ব্যক্তিত্ব ছিল শিশুর মত।

ছোনে মজুমদার, বেরী সর্বাধিকারী এবং রাখাল ভট্টাচার্যের মৃত্যুতে বন্ধুবৎসল সুঁটেদা কি পরিমাণ আঘাত পেয়েছিলেন সেটা কাছ থেকে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

কোন খেলোয়াড় বা সাংবাদিক সাহায্য চেয়ে বিমুখ হননি। এখানে সুঁটে ব্যানার্জি যথার্থই স্পোর্টসম্যান। কথা দিয়ে সেই কথা ফিরিয়ে নিয়েছেন এরকম ঘটনা সুঁটে ব্যানার্জির জীবনে কখনও হয়নি। আবার এই মানুষটির সম্পর্কেই শুনতে হয়েছে—সুঁটে ব্যানার্জি বাংলার জন্য কি করেছেন ? পাল্টা প্রশ্ন করা যায়, বাংলাই বা সুঁটে ব্যানার্জির জন্য কি করেছে ? এ ব্যাপারে সুঁটেদার কাছ থেকেই একটি দুঃখের কাহিনী শুনেছি।

বাংলার হয়ে যেবার সেমিফাইনালে অসাধারণ খেলা খেলে সুঁটেদা বাংলাকে ফাইনালে তুলে দিলেন এবং বাংলা নও-নগরের সম্মুখীন হল সেবার বিহারে তিনি গেলেন ফাইনাল খেলতে। স্টেশনেই পেলেন নওনগরের মহারাজার একটি বার্তা। তাতে লেখা : তুমি এখন বিহারে চাকরিতে জয়েন করেছো। অতএব বাংলার হয়ে তুমি আর খেলতে পারবে না—এমন কি সদ্য ফাইনালও না।

চিঠি পেয়ে ক্ষোভে-দুঃখে কেঁদে ফেল-লেন সুঁটে ব্যানার্জি। বাংলার ম্যানেজারকে বললেন, তদানীন্তন বাংলা ক্রিকেটের কর্ণধার জে সি মুখার্জিকে ট্রাঙ্ক কল করতে। কারণ তখন তিনি ক্যালকাটা কর্পোরেশনের চিফ একজিকিউটিভ অফিসার। তিনি শুধু একটুখানি প্রতিশ্রুতি দিন কলকাতায় ফিরে গেলে একটা চাকরি করে দিতে পারবেন। সব শুনে মুখার্জি সাহেব আগাম কোন প্রতি-শ্রুতি দিতে অসম্মত হলেন।

দুঃখে সুঁটে ব্যানার্জি তখন দর্শক হিসেবে থাকতেই মনস্থির করলেন।

১৯৩৪ সালের বিজয়ী কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ফুটবল ব্যাক ক্রিকেটার সুঁটে ব্যানার্জি। তাই ১৬ আগস্টের ফুটবলের লঙ্কাকাণ্ডে তিনি এক জায়গায় লিখেছেন : কোচরা শুধু খেলাই শেখান। মাঠে কিভাবে ভদ্র আচরণ করতে হয়, তা শেখান না। ফলে যা হবার তাই হয়েছে। আসলে তিনিও ছিলেন স্যার দুখীরামের আবিষ্কার।

১৯৭৩ সালে কলকাতায় তার বেনিফিট ম্যাচ হওয়া পর্যন্ত ভারত ১৯৫৭ সাল থেকে ৮০টি টেস্ট খেলেছে। অথচ ১৯২৬ থেকে '৪৮ পর্যন্ত সুঁটেদার যুগে টেস্ট হয়েছে মাত্র ২০টি। তাই তাকে টেস্ট খেলতে কত মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়েছে।

ইলা পাল জাতীয় সাঁতারে বাংলার মুখ রাখল

লক্ষ্ণৌ থেকে সলিল দেব

লক্ষ্ণৌয়ে অক্টোবরে পাঁচদিনের সাঁইত্রিশতম জাতীয় সাঁতারের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। আসন্ন এশিয়ান গেমস-এর জন্যে ভারতীয় দল গঠনের প্রস্তুতি পর্বে ৪০ জন ওয়াটারপোলো খেলোয়াড় মনোনীত করা হয়েছে প্রতিযোগিতা শেষে। মনোনীতদের নিয়ে আটটি ক্যাম্প হবার কথা ভারতের বিভিন্ন স্থানে। প্রথম ক্যাম্প শুরু হবে বাঙ্গালোরে নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে। গত বছর বাঙ্গালোরে জাতীয় সাঁতার শেষে ঘোষিত ন্যাশনাল কোচদের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ চলবে প্রতিটি স্তরে। বাংলা থেকে সাঁতারে ইলা পাল, বিশ্বজিত দে চৌধুরী, ওয়াটারপোলোতে কানাই রায়, বিদ্যুৎ দে রায়, দেবব্রত ঘোষ ও তাপস দে-র প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগদানের সম্ভাবনা আছে। স্কুলছাত্র সম্ভাবনাময় অভিজিত ঘোষের অন্তর্ভুক্তি অভিপ্রেত, এ ব্যাপারে বিবেচিত হোক সুপ্রিয়া সরদার, বুণু দাস ও রীনা চক্রবর্তী'ও।

ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত সাঁতারুরা নিশ্চয়ই এশিয়ান গেমস-এর কথা স্মরণে রেখে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। সাঁতারে মোট ১৯টি জাতীয় রেকর্ড হয়েছে। পুরুষ বিভাগে ৯টি ও মহিলা বিভাগে ১০টি।

ওয়াটারপোলোয় ১৩টি দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। প্রথম রাউণ্ডে ৪টি গ্রুপে খেলা হয়। রেল, সার্ভিসেস, মহারাষ্ট্র ও বাংলা গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়। সেমিফাইনালে মহারাষ্ট্রকে হারিয়ে সার্ভিসেস ফাইনালে যায়। অপর সেমিফাইনালে রেল ও বাংলার খেলা সর্বাধিক আকর্ষণীয় ছিল। এ খেলায় দুর্ভাগ্যবশতঃ অবধারিত জয় থেকে বাংলা বঞ্চিত হয়েছে। আইনের সূক্ষ্ম বিচারে প্রাপ্ত পেনাল্টি বাংলা পেল না। অবশ্য রি-প্লেতে বাংলা হেরে যায় রেলদলের কাছে। খ্যাতনামা জাতীয় সাঁতারু কৌমাধব তালুকদার বাংলা দলের ওয়াটারপোলো প্রশিক্ষক ছিলেন। মাত্র কয়েকদিনের অনুশীলনে বাংলা দলের খেলায় সমন্বয় ও মুনসিয়ানা দেখা যায়। শেষ পর্যন্ত ফাইনালে রেল যোগ্য দল হিসাবে বিজয়ী, সার্ভিসেস রানার্স, মহারাষ্ট্র তৃতীয় ও বাংলা গতবারের মত এবারও চতুর্থ স্থানে প্রতিযোগিতা শেষ করে।

ডাইভিং-এ বাংলার প্রতিনিধিরা ব্যর্থ হলেও বাংলারই মেয়ে চন্দনা সরকার পি এণ্ড টি-র প্রতিনিধিত্ব করে হাইবোর্ডে শীর্ষ স্থান পায়। স্প্রিং বোর্ডে মহিলা বিভাগে রাজস্থানের গ্রেতা ডি'সুজা ও পুরুষ বিভাগে পুলিশের শেখাবত প্রথম হয়।

দলগতভাবে পুরুষ বিভাগে ভারতীয় পুলিশ ১৪৬ পয়েন্টে বিজয়ী, রেল ৭৯ পয়েন্টে দ্বিতীয় ও ৭৮ পয়েন্টে তৃতীয় হয়েছে সার্ভিসেস।

মহিলা বিভাগে মহারাষ্ট্র ১৪৮ পয়েন্ট সংগ্রহের সুবাদে বিজয়ী হয়েছে। বাংলা ৭৮ পয়েন্টে দ্বিতীয় ও কেরালা ৬৩ পয়েন্টে



ইলা পাল

তৃতীয় হয়েছে।

বাংলাদেশে মহিলা বিভাগে সবচেয়ে কৃতিত্বের অধিকারিণী ইলা পাল। ব্রেস্টস্ট্রোক ইভেন্টে ১০০ প্রথম ও ২০০ দ্বিতীয় হয়েছে। সুপ্রিয়া সরদার মহারাষ্ট্রের সঙ্গে সমান তালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১০০ ব্যাকস্ট্রোকে দ্বিতীয় হয়। দলগত ভাবে ১টি সোনা, ৩টি রুপো ও ৫টি ব্রোঞ্জ বাংলা মহিলাদল সংগ্রহ করে। এই বিভাগে জাতীয় সাঁতারে সবক'টি রেকর্ড মহারাষ্ট্রের সাঁতারুদের। ব্যতিক্রম ২০০ ব্রেস্ট স্ট্রোকে মণিপুরের কিরণমালা দেবী ও ইলা পাল। ৩ মিঃ ৪·৬ সেঃ যুগ্ম রেকর্ডের অধিকারিণী



আশিস চক্রবর্তী—বাটারফ্লাই

মহারাষ্ট্রের অনিতা সুদ সবচেয়ে সফল সাঁতারু। সহযোগী নিজ দলের পারসিস ম্যাডানের নামও রেকর্ডের তালিকাভুক্ত হয়েছে। অনিতা ফ্রিস্টাইল ১০০, ২০০, ৪০০ ও ৮০০ ইভেন্টে ১ মিঃ ০৩·৮ সেঃ, ২ মিঃ ২১ সেঃ, ৫ মিঃ ০৪·৪ সেঃ ও ১০ মিঃ ২৫·৮ সেঃ এবং ২০০, ৪০০ ইণ্ডিভিজুয়াল মেডলি—২ মিঃ ৪৩·৬ সেঃ, ৫ মিঃ ৪৭·২ সেঃ ও পারসিস ম্যাডান ২০০ বাটারফ্লাই ২ মিঃ ৪২·২ সেঃ, ১০০ বাটারফ্লাই ১ মিঃ ১৩·২ সেঃ অনিতা সুদের সঙ্গে যুগ্ম রেকর্ড সহ নতুন রেকর্ড করেছেন।

পুরুষ বিভাগে বাংলার বিশ্বজিত দে চৌধুরীর হতাশাব্যঞ্জক পারফরমেন্স অভিপ্রেত ছিল না। বাংলার স্কুল ছাত্র অভিজিত ঘোষ সম্ভাবনায় ভরপুর হয়েও প্রতিযোগিতার দিনগুলোতে অসুস্থ হয়ে আশানুরূপ ফল দেখাতে পারেনি। দলগতভাবে বাংলার পুরুষ সাঁতারুরা মাত্র ৫টি ব্রোঞ্জ পেয়েছে। এই বিভাগে ভারতীয় পুলিশ প্রতিনিধিদের কৃতিত্ব প্রশংসার যোগ্য। সবক'টি রেকর্ডের অধিকারী পুলিশ সাঁতারুরাই। জেকব, বিনোদ, সোমশেখরণ, খোবা সিং ও আশীষ চক্রবর্তী নতুন রেকর্ড করার কৃতিত্ব দেখিয়েছে। জেকব ২০০ বাটারফ্লাই, ২০০ ও ৪০০ ইণ্ডিভিজুয়াল মেডলে যথাক্রমে ২ মিঃ ২২·৮ সেঃ, ২ মিঃ ২৮·৬ সেঃ ও ৫ মিঃ ২২·৩ সেঃ, সোমশেখরণ ১০০ ফ্রিস্টাইল ৫৭·১ সেঃ, আশীষ চক্রবর্তী ১০০ বাটারফ্লাই ১ মিঃ ০১·৪ সেঃ, খোবা সিং ১০০ ব্রেস্টস্ট্রোক ১ মিঃ ১২·৯ সেঃ, বিনোদ মহাজন ১০০ ব্যাকস্ট্রোক ১ মিঃ ০৭·৩ সেঃ ও পুলিশ দল ৪×২০০ ফ্রিস্টাইল রিলে ৯ মিঃ ০৪·২ সেঃ, ৪×১০০ মেডলে রিলে ৪ মিঃ ১৮ সেঃ রেকর্ড করেছেন।

লক্ষ্ণৌয় নতুন রেকর্ড হয়েছে বেশ ক'টি, কিন্তু প্রতিযোগিতায় উদ্দীপনার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। স্বর্গীয় কে ডি সিং বাবুর নামে স্টেডিয়াম সংলগ্ন সুইমিং পুলটি শহরের অভ্যন্তরে অবস্থিত। পুলে অ্যালাম ও ক্লোরিনের ভাগ অল্প থাকায় জল স্বচ্ছ ও পরিষ্কার ছিল না, অনেকটা পরিচ্ছন্ন পুকুরের মত মনে হয়েছে। সুবিধা হয়েছে তাদের, যারা পুকুর, নদীতে অনুশীলনে অভ্যস্ত। অবশ্য পুলটি স্ট্যাণ্ডার্ড মাপের। সাঁতার, ডাইভিং, ওয়াটারপোলো একই কোর্সে হয়েছে। এখানে দর্শকদের আসন সীমিত। মার্চপাস্টে দলের সব প্রতিনিধির অংশগ্রহণ সম্ভব হয়নি পুলের পরিসরের অপ্রশস্ততার জন্যে। উদ্যোক্তাদের অনুষ্ঠান সাফল্যের দিকে নজর থাকলেও অভিজ্ঞতার অভাবে কোনদিনই সময়সূচী রক্ষা করা হয়নি। ওয়াটারপোলো রেফারির পরিচালনা ত্রুটিপূর্ণ। খেলাধূলা আনন্দের বিষয়। অভিজ্ঞ ও দক্ষ প্রশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে দল উন্নতি করে। আবার রেফারির নিরপেক্ষতা ও বিচক্ষণতার অভাব খেলার মান অবনমিত করে দেয়, খেলোয়াড়ে খেলোয়াড়ে সংঘাত লাগে, দর্শক বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ওয়াটারপোলো খেলায় এ দৃশ্য দেখা গেল জাতীয় প্রতিযোগিতায়।

সাঁতারে রেল দলের আধিপত্য শেষ হয়ে এসেছে। সার্ভিসেস অল্পবয়সী ছেলেদের সংগ্রহ করে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে। সেখানে খেলাধূলার সুযোগ নিয়ে অনেকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পরবর্তী জীবনে। কোন রাজ্যই অবশ্য তেমন সুযোগ দিতে পাচ্ছে না সাঁতারুদের, ব্যতিক্রম শুধু কেরালা রাজ্য। তবে, রাজ্যে অবস্থিত কেন্দ্রিয় সংস্থা এফ সি আই, কাস্টমস, স্টেট ব্যাঙ্ক ইত্যাদি কিছুসংখ্যক সাঁতারুকে চাকুরি দিয়ে রাজ্য দলে কৃতী সাঁতারু ধরে রাখতে সহায়তা করছে। ভারতীয় পুলিশ এবছরই প্রথম একক দল হিসাবে জাতীয় সাঁতারে অংশগ্রহণ করেছে ও শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতিতে ভাস্বর হয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে নিয়মিত অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকের অধীনে নিবিড় অনুশীলনের ব্যবস্থা থাকায় এবং সর্বোপরি তাদের শৃঙ্খলাবোধই করেছে তাদের সফলকাম। কোচ, কর্মকর্তাদের প্রতি সম্ভ্রমবোধ তাদের জয়যাত্রাকে পরিপূর্ণ সফলতার পথে এগিয়ে যেতে সহায়তা করেছে।

এখনই চেষ্টা শুরু করলে এশিয়ান গেমসে সাঁতার-পদক পাওয়া যেতে পারে

তরুণ গোস্বামী

জাতীয় সাঁতারের ফলের বিশ্লেষণ করতে গেলে প্রথমেই স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে আমরা এশিয়ান গেমসের পদক লাভের ক্ষেত্রে অনেক দূরে। তবে বেশ কিছু সাঁতারু তাদের উন্নতমান দেখিয়ে অন্তত কিছুটা আশার বাণী শুনিয়েছে, যার মধ্যে পুলিশের সোমশেখরণ, মহাজন আশীষ চক্রবর্তী, জ্যাকব, থোবা সিং, ব্রিজকান্ত শর্মা, পদ্মনাভন, রেলওয়ের সঞ্জীব চক্রবর্তী, আশিস দাস, নিতাই পুরকায়েত, সার্ভিসেসের রামকুমার, পাঞ্জাবের মনজিত সিং ঢল, কেরালার চেরিয়ান ও মাধব দাস প্রভৃতি। হয়তো আগামী দু'বছরের মধ্যে এরা ছাড়াও আরও কিছু নতুন মুখ দেখতে পাবো। বাংলার বিশ্বজিত দে চৌধুরী, অভিজিত ঘোষ, ইলা পাল, বুনু দাস, রীনা চক্রবর্তী, মহারাষ্ট্রের অনিতা সুদ, পাশী মদন শেঠনা, তামিলনাড়ুর রাধিকা শ্রীনিবাসন, মণিপুরের কিরণমালা, সূর্যমুখী প্রভৃতি আরও উন্নত হবে। উপরন্তু আগামী দু বছরে উপযুক্ত ট্রেনিং, খাদ্য ও সুযোগ পেলে এরাই ভারতের সম্মানকে বাঁচিয়ে রাখবার প্রয়াসী হবে।

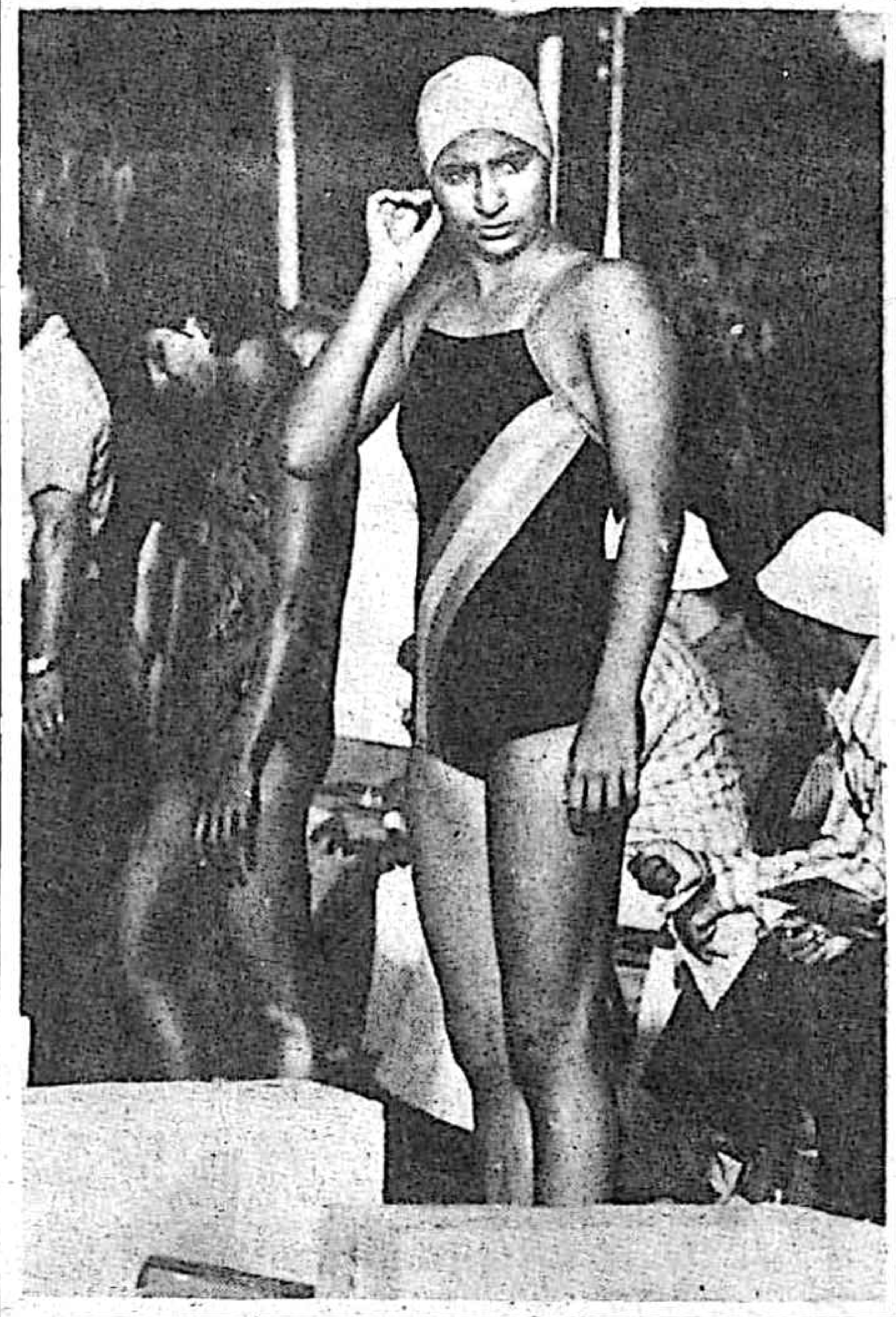


উইলসন চেরিয়ান

পুরুষ ও মহিলা বিভাগের দুটি ডাইভিং-এর বিভাগের মান মোটেই উন্নত নয় এবং খুব একটা আশাপ্রদও নয়।

এবারের জাতীয় ওয়াটারপোলোতে সামগ্রিক মানের বিচার করতে গেলে প্রথমেই মনে হয় যেন ক্রমশ প্রস্তর যুগে চলেছি। যেন তেন প্রকারে খেলা জেতাই আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার বেশ কিছু খেলোয়াড়কে এবার দেখা গেছে যাদেরকে নিয়মিত ট্রেনিং ও প্রতিযোগিতায় অংশ নেবার সুযোগ দিলে এবং অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পেলে যারা ভারতকে আগামী দু'বছরে হয়তো খুব একটা নিরাশ করবে না। তবে সবচেয়ে দুঃখের এই ওয়াটারপোলোর উন্নতির জন্যে যদি কিছু হয় তবে তা কেবল এই কলকাতায়। সারা ভারতের অন্যান্য জায়গায় এতটা উৎসাহ দেখান হয় না। যেটুকু হয় তা দেশের প্রয়োজনের তুলনায় হাস্যকর। সারা ভারত জুড়ে যদি সব রাজ্য ওয়াটারপোলোর জন্য সচেষ্ট না হয় তাহলে তো এই খেলা সীমাবদ্ধ থেকে যাচ্ছে শুধু বাংলায়।

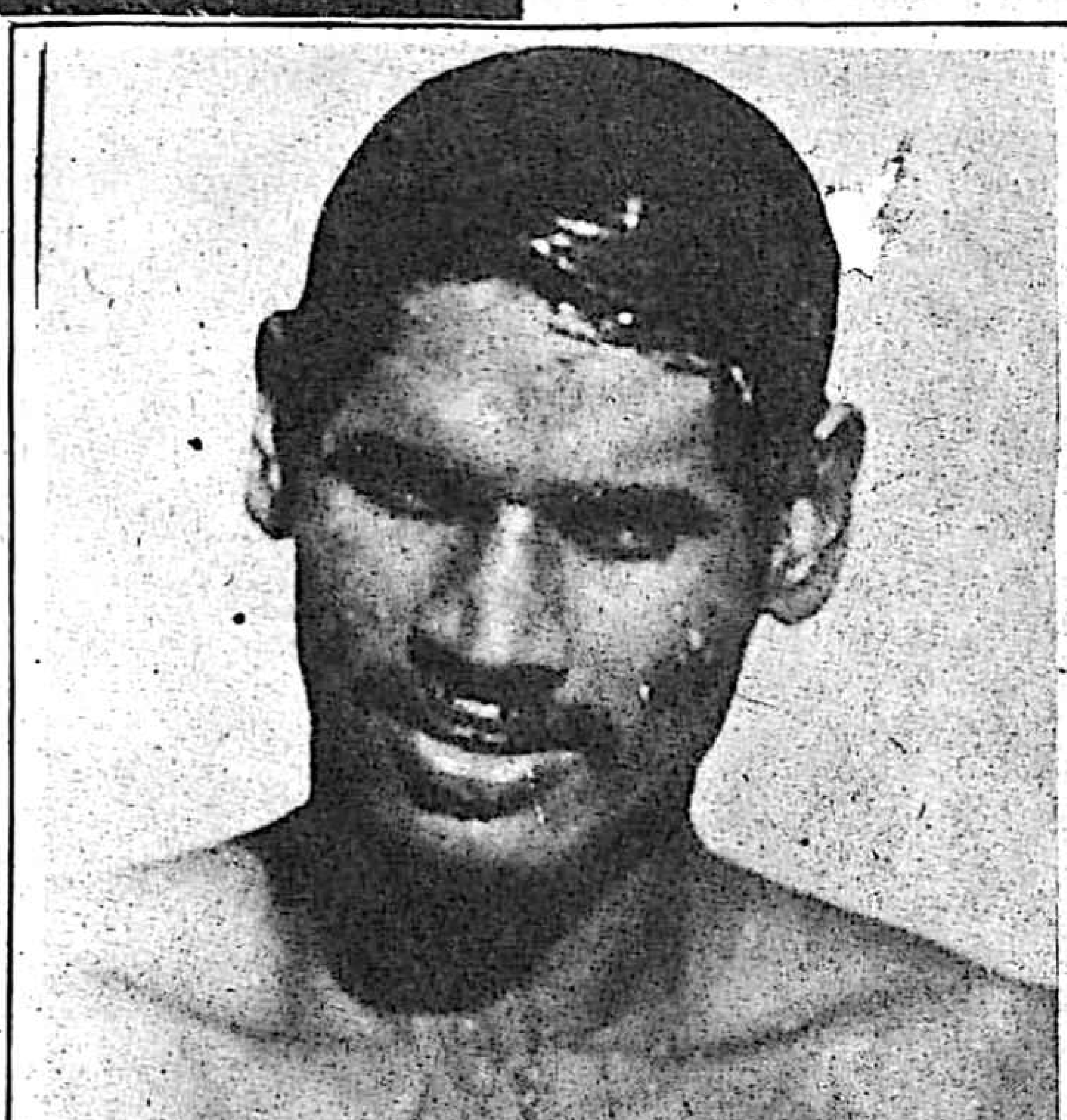
এই বাংলায় অনুশীলনকারী রেলওয়ে দল, বাংলা ও তারপর রেলের অতিরিক্ত খেলোয়াড় পুষ্ট ন্যাশনাল সুইমিং ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দল। এছাড়া সার্ভিসেস, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব ও কেরালা থাকলেও যদি বাংলার এই সমস্ত খেলোয়াড়রা তাদের নিজেদের স্বাভাবিক নৈপুণ্য দেখাতে পারে, তবে তাদেরকে হটিয়ে জায়গা করে নেবার ক্ষমতা সারা ভারতে খুব কম দলেরই আছে। অতএব যদি নিরপেক্ষ ভারতীয় দল গঠন করতে হয় তবে বেশীর ভাগ খেলোয়াড়ই থাকা উচিত এই কলকাতা থেকে। পক্ষপাত করে নয়, তারা তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী স্থান পাবার যোগ্য। শুধু দরকার ব্যাপক পরিকল্পনা, যা শুধু ধাপে ধাপে উন্নতির সোপানে নিয়ে যাবে।



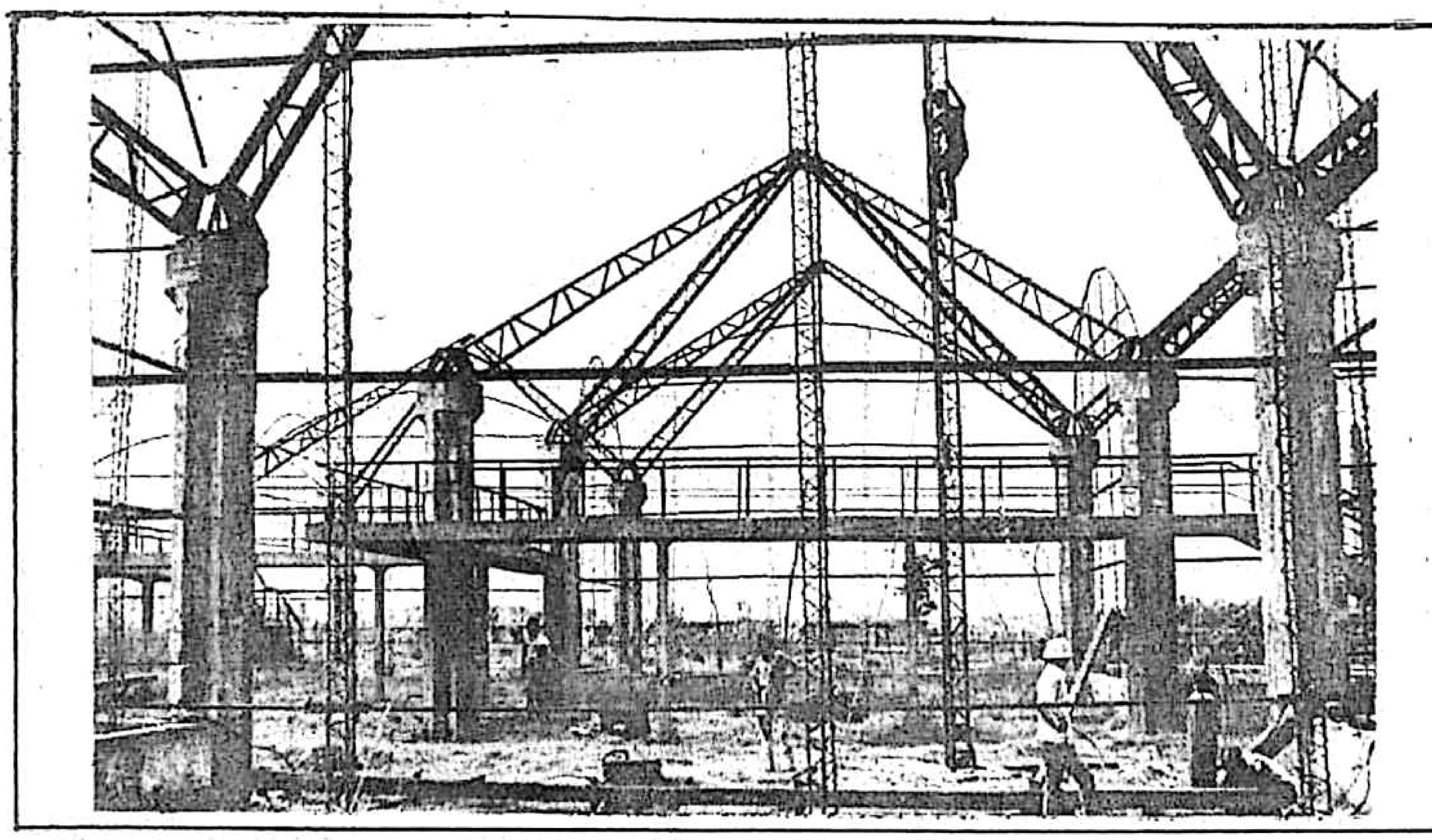
অনিতা সুদ। ছবি: এস দে রায়

জাতীয় সাঁতারের শেষে সারা ভারত জুড়ে ৪৩ জন সাঁতারু ৪০ জন ওয়াটারপোলো খেলোয়াড় ও ২০ জন ডাইভার নির্বাচিত হয়েছেন, যাদেরকে ১৯৮১ সালের ডিসেম্বর অবধি অন্তত ৬/৮টি কোচিং ক্যাম্পে যোগ দিতে হবে ভারত সরকার ও এস এফ আই-এর তত্ত্বাবধানে। এদের মধ্যে থেকেই নির্বাচিত হবে ভারতীয় দল ১৯৮২ সালে এশিয়ান গেমসের জন্য।

এই প্রথম এশিয়ান গেমসের প্রস্তুতি। কোনও সৎ প্রচেষ্টা বিফলে যায় না। অতএব আমরা আশা করতে পারি যে এদের মধ্যে থেকেই ভবিষ্যত ভারতীয় দল ধুলিসাৎ ভারতীয় সম্মান ফিরিয়ে আনতে চেষ্টার কোন কসুর করবে না।



সোমশেখরণ



বিধান নগরে সাফারি পার্কে খেলার স্বর্গ এবং অন্যত্র অপব্যয়

নিজস্ব প্রতিনিধি

জনবসতি অঞ্চল পেরিয়ে নির্মীয়মান জন আবাসনকে বাঁয়ে রেখে আরও দূরে সেই সল্ট লেক যা বিধান নগরীর জনমানবহীন শেষ প্রান্তে এক মনোরম পরিবেশ—শিশু উদ্যান। যেন সীমাহীন সমুদ্রে একটি সদ্য বিকশিত শ্যামল দ্বীপ। ঝকঝকে টয় ট্রেনটা তখন দৃষ্টির বাইরে। সদ্য সমাপ্ত রেল স্টেশনের সামনে শূন্য প্লাটফর্মের অদূরে একটি কামরা। কিছু লোক কাজ করছেন মানুষের তৈরি পাহাড়ের টিলায়, লেকের ধারে। আর অফিসার-এঞ্জিনিয়ারগণ তদারকী করছেন, দেখছেন ফিনিসিং টাচ দেবার জন্য আর কি করবার আছে। শিশু দরদী জওহরলাল নেহরুর আগামী জন্মদিনে এর উদ্বোধন। এটা তারই প্রস্তুতি।

বিশাল উপনগরী আর কলকাতা মহানগরীর আর একটি আকর্ষণ এই শিশু স্বর্গটি গড়ে উঠছে ৩৮ একর জমির উপরে। তৈরি করছে সি এম ডি এ। ব্যয় হচ্ছে পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা। এক মাইল দীর্ঘ খেলনা রেলের লাইন পাতা হয়েছে। মূল স্টেশন ছাড়াও তৈরি হয়েছে লোকো কারশেড, ওয়ার্কশপ, বিভিন্ন ফ্লাগ স্টেশন। ফ্লাগ স্টেশনগুলি হয়েছে পাহাড়ে গুহার গায়ে, ফুলে আর পাহাড়ী গাছে সাজানো টিলার ধারে, লেকের পাড়ে, সর্পোদ্যানের মধ্যে আর পাখির 'খাঁচার' পাশে।

ঘেরা ঘাস বনের মধ্যে হরিণ দম্পতি অগোচরে বিচরণ করছে মনের সুখে। এদের সংসারে পোষ্য সংখ্যা বাড়লে তবেই চোখে ধরা পড়বে। এখন মানুষের সাড়া পেলেই তারা চলে যায় আড়ালে, ঘাস বনের গভীরে।

সর্পোদ্যানে থাকবে পঁচিশ-এর বেশি নির্বিষ আর বিষধর সাপ। তদারকী করবেন সর্প বিশেষজ্ঞ দীপক মিত্রের তরুণী সহকারীরা। পাখির বিশাল খাঁচা তৈরি হয়েছে কম বেশি ষাট ফুট উঁচু। মধ্যে ১০/১৬ ফুট উঁচু পথে (ফ্লাইওভার) ঘুরে ঘুরে দেখা যাবে খাঁচা-বন্ধ পাখির মুক্ত বিচরণ। লেকের জলে পোষা হাঁসের সঙ্গে খেলা করার জন্য থাকবে ছোট নৌকা। আর পাশের ঝিলটার দখল পাওয়া গেলে তৈরি হবে রোয়িং ক্যানাল। এসব দেখেশুনে একটা শারীর-চর্চার পূর্ণাঙ্গ পাঠ সম্পন্ন হবে শিশু আর তাদের অভিভাবকদের।

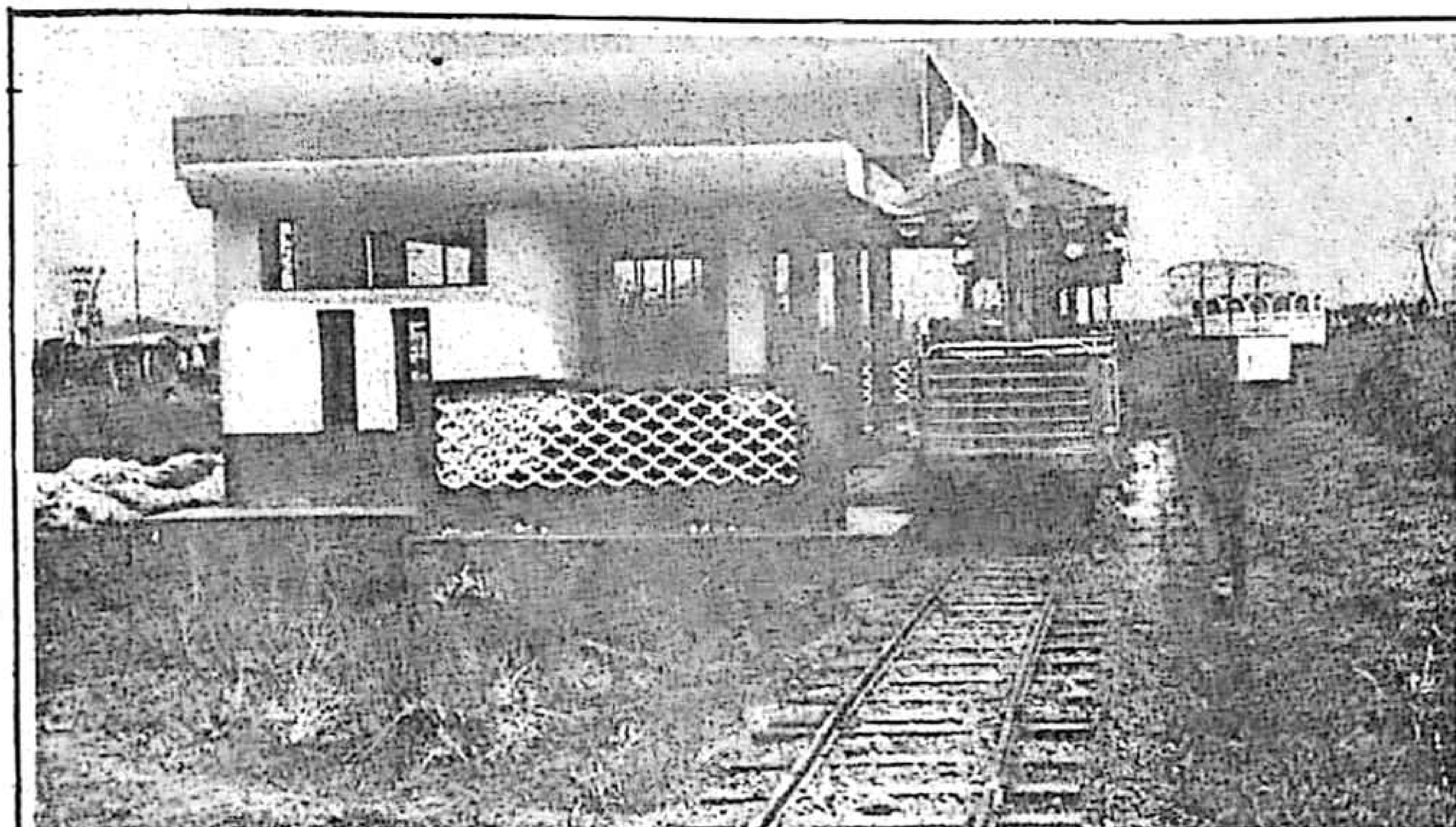
এই বিশাল কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছিল ১৯৭৬ সালে। তখনকার নগর পরিকল্পনা মন্ত্রী ভোলানাথ সেন বিধানচন্দ্র রায়ের স্বপ্নকে রূপ দেবার জন্য এই পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেছিলেন। শুরুতেই পরিকল্পনা মত গাছগাছড়া লাগানো হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭৮ সালের বন্যা তাদের নির্মূল করে দিয়েছে। তার পরে লাগানো গাছগুলি এখনও শৈশব কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তাছাড়া কর্মীদের যত্নের অভাবেও এদের বৃদ্ধি হয়েছে ব্যাহত। উপরওয়ালাদের হাঁকডাকে যতটুকু যত্ন হয়। প্রয়োজন তার থেকেও বেশি। এইজন্য বছর বছর কিছু কিছু ব্যয় করার মধ্যে রয়েছে সি এম ডি এর বার্ষিক পার্ক, খেলার মাঠ উন্নয়ন বরাদ্দের একাংশ। এবছরও ওই বাবদে বরাদ্দ ২৫ লক্ষ টাকা থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে ওই শিশু স্বর্গের জন্য। 'সল্ট লেক সাফারি পার্ক' বলে পরিচিত এই উদ্যানের নামে সরকারী তকমা এখনও পড়েনি। অর্থাৎ সরকারীভাবে এর কোন নামকরণ এখনও হয়নি। হবে উদ্বোধনের আগে। আপাতত জনশূন্য এই প্রান্তরে কিছুদিনের মধ্যে নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে কাজ চলবে। চলবে আরও অনেক যানবাহন। যাবেন অনেক মানুষ সপরিবারে শিশুর দেশে কিছুক্ষণ কাটাতে, জন ও যান কোলাহল থেকে দূরে। প্রকৃতির রাজ্যে নিজেদের স্বল্প সময়ের জন্য সঁপে দিতে। সেই সঙ্গে পাওয়া যাবে একটি বাষ্প-চালিত শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র (উইণ্ডমিল)। এ থেকেই এই

সাফারি পার্কে টয় ট্রেন চলছে





সাফারি পার্কের ক্যান্টিন



রেল স্টেশন—সাম্রাজ্যি পার্কে

বিদ্যুতের চাহিদা মিটবে বলে আশা করা যায়।

এই সঙ্গে সি এম ডি এ-র বর্তমান বছরের খেলার মাঠ ও পার্ক উন্নয়ন-কর্মসূচী আলোচনা করা যেতে পারে। এই সংস্থা ১৯৮০-৮১ সালের জন্য ওই কর্মকাণ্ডের জন্য বরাদ্দ করেছে ২৫ লক্ষ টাকা। এত সামান্য টাকা কলকাতা ও মেট্রোপলিটন অঞ্চলে প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই সামান্য। তা সত্ত্বেও এক গাদা কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে। এইসব কাজের মধ্যে আছে রিজেন্ট এস্টেট খেলার মাঠ, চন্দননগর কুঠির মাঠ খেলার মাঠ ও বাঙ্গুর এভিনিউ খেলার মাঠ সংস্কার। ভবানীপুর পদ্মপুকুর পার্ক-এর রেলিং তৈরি, খড়দহ নতুন পল্লী শিশু উদ্যান ও রিভার সাইড পার্ক সংস্কার এবং বারাসতের সাতটি শিশু পার্ক-এর উন্নতি বিধান। এই সব হল খেলা বা বেড়ানো সংশ্লিষ্ট। এগুলি অপাত্রে দান বা অপব্যয় নিশ্চয়ই নয়। বিশেষভাবে পদ্মপুকুর পার্কের কথা নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য। কারণ এই পার্কেই রয়েছে সুইমিং ট্যাংক। যেখানে অনুষ্ঠিত হয় নানা ধরনের জলক্রীড়া ও সাঁতার প্রতিযোগিতা। রেলিংগুলি চুরি হয়ে যাবার ফলে কয়েক বছর ধরেই এখানে সংরক্ষিত জলাশয়ে মানুষের নিত্য কর্মকেন্দ্র সম্পন্ন হয়ে আসছে। বিশুদ্ধ জলাশয় এখন পরিত্যক্ত জলাভূমিতে পরিণত। তার মধ্যেই হয় সাঁতার অনুশীলন ও প্রতিযোগিতা। এবারে রেলিং তৈরির পরে রক্ষণাবেক্ষণে কর্মীদের দায়িত্ব পালন, পুলিশের সহযোগিতা ও মানুষের নাগরিক বোধের যুক্ত প্রচেষ্টায় নিশ্চয়ই সাঁতার পুলটির স্বাতন্ত্র রক্ষা করা সম্ভব হবে।

খেলার টাকা অন্য খাতে

এই ব্যয়ের বাইরে কয়েক লক্ষ টাকা খেলাধূলার খাতে অপব্যয়ের নজিরও পাওয়া গেছে। যেমন রাস্তার ধারে গাছ লাগাবে রোটারি ক্লাব, তার জন্য তারের জালে ঘিরে দেবে সি এম ডি এ। এই অর্থ ব্যয় করা হবে খেলার মাঠের জন্য বরাদ্দ থেকে। অপব্যয় এখানে শেষ হলে তবু না হয় মেনে নেওয়া যেত। কিন্তু তা নয়। এই ধরনের সীমার বাইরে শ্মশান আর গোরস্থানের কল্যাণে ব্যয় করা হচ্ছে ওই 'ব্যাঙের আধুলি' পঁচিশ লক্ষ টাকা থেকেই। এবছর নিমতলা শ্মশানে স্থায়ী আলোর ব্যবস্থা ও বাঁশতলা গোরস্থানের পাঁচিল দেবার জন্য অর্থ ব্যয় করা হয়েছে ওই খেলার খাত থেকে। বাগমারী গোরস্থান উন্নয়নের প্রস্তাবও বিবেচনাধীন রয়েছে।

অথচ শ্মশান, গোরস্থান ও সিমেট্রি ক্রিমেটোরিয়াম উন্নয়নের জন্য কলকাতা পুরসভায় রয়েছে স্থায়ী বিভাগ। আর বরাদ্দ! কলকাতা পুরসভার বাজেটে (১৯৮০-৮১) দেখা যায় শ্মশান উন্নয়ন ও সংরক্ষণে—৩ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা, ক্রিমেটোরিয়াম-সিমেট্রির জন্য ৫ লক্ষ ৭৫ হাজার এবং গোরস্থানের জন্য ৯ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা বরাদ্দ হয়েছে। বেদনার হলেও একথা সত্য প্রায় এই সাড়ে ১৮ লক্ষ টাকার অর্ধেক বরাদ্দই কর্মীদের বেতন ইত্যাদি প্রশাসনিক ব্যয়ের জন্য। ৪ লক্ষ টাকা রক্ষণাবেক্ষণ। দেড় লক্ষ টাকার জিনিসপত্র কেনা এবং বিবিধ খাতে ৪ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ধরা আছে। অর্থাৎ দেড় লক্ষ বা ২ লক্ষ টাকায় কাজ করার জন্য পনের লক্ষ টাকা খরচ করা হচ্ছে।

প্রশ্ন থেকেই যায়—কেন এই অবস্থা? কেন খেলার মাঠে বেশি বরাদ্দ হবে না? কেন বরাদ্দ অর্থ অন্য খাতে ব্যয় হবে? এবং তারপরে দেশের ক্রীড়ামান, আর মাঠে হাঙ্গামার জন্য আপসোস করা হবে?

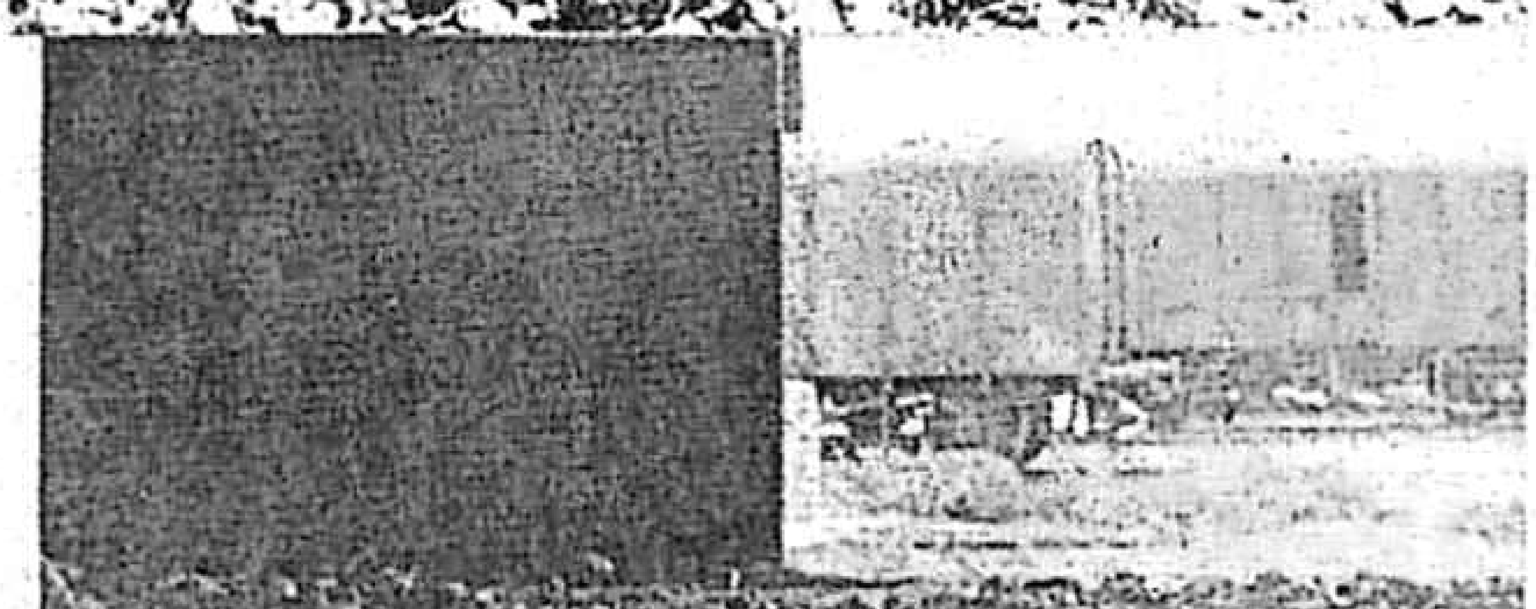
পরিবর্তন

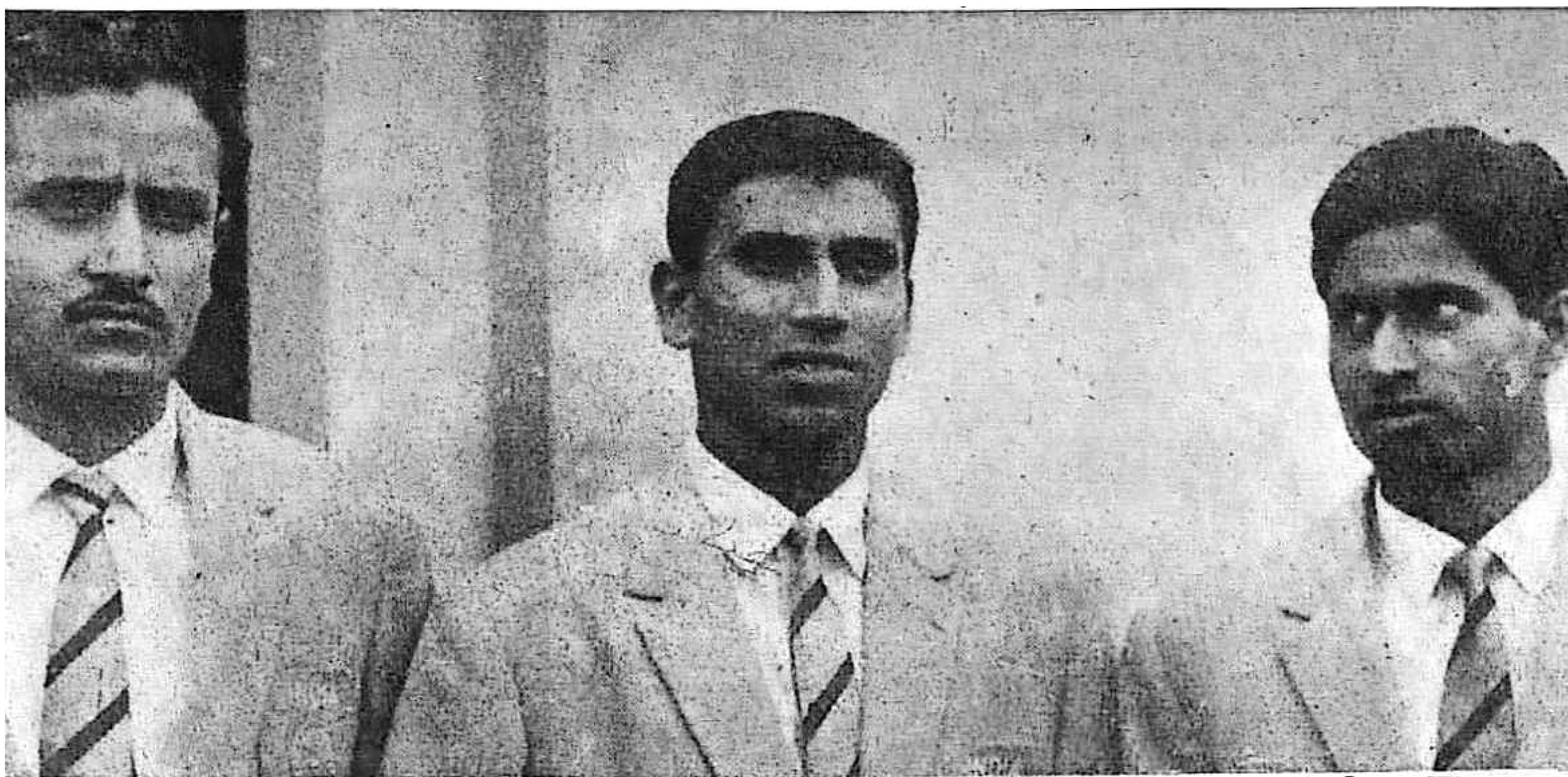
॥ ১ নভেমবর সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ ॥

- বাংলার পশ্চিম সীমান্তে, শাল মহুয়ার দেশে নাচ দেখিয়ে বেড়ায় নাগিনীকন্যা উর্বশীরা। নাম তাদের নাচনী। কেউ ধুমরিয়া, কেউ বাঈ। কি করে তারা এপথে আসে? কারা পোষে তাদের? তাদের নিয়ে ব্যবসাই বা চালায় কারা? নাচনীদের সামাজিক ভূমিকা কি? ওদের কি বিয়ে হয়? বহু ফটো সহ সামাজিক সমীক্ষা-ভিত্তিক অসাধারণ প্রচ্ছদ কাহিনী।
- রেলবাবু আর বেওসায়ীদের যোগসাজসে শালিমার রেলবন্দরে চলছে নানা দু'নমবরী কারবার। ভোগে পূর্বভারতের সাধারণ মানুষ। কেমন করে ওরা কৃত্রিম ঘাটতি সৃষ্টি করে? রেল যে লাখ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ গোনে, তা সবই কি সঙ্গত কারণে? ঈশ্বরের আইন বস্তুটা কী? শালিমারে কিভাবে বাঙালী বিরোধী চক্রান্ত চলে?
- চুঙ্গিকর থাকবে না উঠে যাবে, এ প্রশ্নে জোর তর্ক চলছে। ব্যাপক দুর্নীতি চুঙ্গি করের উদ্দেশ্য অনেকটাই ব্যর্থ করে দেয়। কি ভাবে?
- ফ্লপ পরিচালক অ্যাটনবরো গান্ধীজীকে নিয়ে ছবি করছেন। ভারত সরকারের সংস্থা গুনছে অন্তত পাঁচ কোটি টাকা। এন এফ ডি সি হঠাৎ এত উদার কেন?

ইত্যাদি প্রকাশনী প্রাঃ লিঃ, কলকাতা ৭২







৬২-র এশিয়ান গেমসে জাকার্তায় পথে প্রদ্যোৎ বর্মণ, পি কে ব্যানার্জি ও প্রশান্ত সিংহ



অতীতের ⚽ তারকা: প্রদ্যোৎ বর্মণ

মোহন বাগানের হয়ে গোলরক্ষা করছেন প্রদ্যোৎ, পাশে জার্নেল সিং



চন্দ্রশেখর, রহিম ও প্রদ্যোৎ বর্মণ





প্রদ্যোৎ বর্মণ



চন্দননগর জেলা একাদশের সঙ্গে



বল গ্রিপ করতে উদ্যত প্রদ্যোৎ

ছবি ঃ মনোজিত চন্দ





মোহন বাগান-ইস্টার্ন রেল ম্যাচ—বল গ্রিপ করছেন প্রদ্যোৎ—দু'পাশে জার্নেল ও পি কে

প্রদ্যোৎ বর্মণের সঙ্গে কমল সরকার



মস্কো ওলিম্পিক্সে পূর্ব জার্মানির সাফল্য অভূতপূর্ব

অতীন সরকার

'আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় শারীরচর্চা ও খেলাধূলা ক্রমেই বেশি করে প্রাধান্য পাচ্ছে। এর ফলে সাধারণ মানুষের শরীর সুস্থ থাকে, চিত্তবিনোদনের সুযোগ ঘটে, তাদের কর্ম ক্ষমতা বাড়ে এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশে সুযোগ হয়ে থাকে।'

একথা বলেছেন গণতান্ত্রিক জার্মানির রাষ্ট্রপ্রধান ও রাষ্ট্রপরিচালক স্যেস্যালিস্ট ইউনিটি পার্টির সাধারণ সম্পাদক এরিথ হোনেকার।

বস্তুত সমাজতান্ত্রিক দেশে শারীরচর্চার জন্য ব্যয়কে মনে করা হয় উৎপাদনখাতে বিনিয়োগ হিসাবে। কথাটা একটু সহজ বোধ্য করলে বলা যায় যে শরীর সুদৃঢ় ও উৎফুল্ল থাকলে রোগের আক্রমণ সহজেই প্রতিরোধ করা যায় এবং সুস্থ দেহ স্বাস্থ্য বা চিকিৎসা খাতে ব্যয় কমায় আর উৎপাদনে সাহায্য করে। ফলে শারীরচর্চার জন্য ব্যয় করার মধ্য দিয়ে একই সঙ্গে দু'দিক থেকে লাভবান হওয়া যায়। সমাজতান্ত্রিক জি ডি আর বা পূর্ব জার্মানি ওই চিন্তাধারার বাস্তব রূপায়ণের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। তাই সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সে দেশে গড়ে উঠেছে গণ-ক্রীড়া জাগরণ। তারই প্রতিফলন দেখা গেছে ওলিম্পিক্স ক্রীড়াঙ্গণে, বিশেষভাবে সদ্য সমাপ্ত মস্কো ওলিম্পিক্সে।

জার্মানি দেশ হিসাবে আধুনিক ওলিম্পিক্সের প্রথম থেকেই অংশগ্রহণ করছে দক্ষতার সঙ্গে। ১৯৩৬ সালে অনুষ্ঠিত বার্লিন ওলিম্পিক্সে তখনকার নাৎসী রাষ্ট্রনায়ক হিটলার ওলিম্পিক্স আদর্শ ও রীতি ভঙ্গ করে নিজ মতবাদের প্রচার মঞ্চ হিসাবে ১১ শ ওলিম্পিক্সকে ব্যবহার করেন। আর তারপরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্য ২টি ওলিম্পিক্স অনুষ্ঠিত হয়নি। পরের দুটি ওলিম্পিক্সে যুদ্ধ অপরাধী জার্মানিকে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয়নি। ইতিমধ্যে জার্মানি দুই ভাগে বিভক্ত হয় এবং একদিকে সমাজতন্ত্র ও অন্যদিকে (পশ্চিম জার্মানি) ধনতন্ত্রকে সমাজ ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করা হয়। এই অবস্থা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক ওলিম্পিক্স কমিটি দুই জার্মানিকে যুক্তভাবে ওলিম্পিক্সে যোগ দিতে দেয় ১৯৬৪ সালের টোকিও ওলিম্পিক্স পর্যন্ত। অর্থাৎ ১৬শ, ১৭ ও ১৮শ ওলিম্পিক্সে যুক্ত জার্মান দল ওলিম্পিক্স ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। তা সত্ত্বেও পদক তালিকা অনুধাবন করলে দেখা যায় সমাজতান্ত্রিক জার্মানি সহযাত্রী ধনতান্ত্রিক জার্মানিকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছে। যেমন পদক আলাদা করলে দেখা গেল মেলবোর্নএ (১৯৫৬) জি ডি আর—পঞ্চদশ স্থান অধিকার করেছিল। ১৯৬০ সালে রোমে দশম এবং ১৯৬৪ সালে টোকিও ওলিম্পিক্সে অষ্টম স্থান অধিকার করতে সক্ষম হয় জি ডি আর।

অবশেষে আন্তর্জাতিক ওলিম্পিক্স কমিটি বাস্তব পরিস্থিতি মেনে নেয় এবং ১৯৬৮ সালের মেক্সিকো ওলিম্পিক্সে দুই জার্মানিকে আলাদাভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ দেয়। পূর্ব জার্মানি এই সুযোগকে সঠিকভাবে কাজে লাগায় এবং তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে দিয়ে অধিকার করে তৃতীয়স্থান। ১৯৭২ সালে পশ্চিম জার্মানির মিউনিখে অনুষ্ঠিত বিংশতি ওলিম্পিক্সেও জার্মান ডেমোক্রেটিস রিপাব্লিকের স্থান তৃতীয়ই থাকে। ১৯৭৬ সালে মণ্ট্রিয়ল ওলিম্পিক্সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তৃতীয়স্থানে সরিয়ে দিয়ে জি ডি আর দ্বিতীয়স্থান অধিকার করে সমাজতান্ত্রিক সমাজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

জি ডি আর-এর এই অগ্রগতি পরবর্তী চার বছরে আরও গতিলাভ করে। তারই প্রতিফলন ১৯৮০ সালের শীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লেকপ্ল্যাসিডে শীতকালীন এবং গ্রীষ্মে মস্কোতে গ্রীষ্মকালীন ওলিম্পিক্স ক্রীড়া প্রতিযোগিতায়।

লেকপ্ল্যাসিডে স্বর্ণপদক সংখ্যায় জি ডি আর সোভিয়েত ইউনিয়নের (প্রথম) পরেই স্থান লাভ করে। কিন্তু মোট পদক ও বেসরকারী পয়েন্টে (১৫৫ পয়েন্ট) ওই দেশ প্রথমস্থান অধিকার করে। মস্কোতে তার স্থান দ্বিতীয় হলেও অনেকগুলি নতুন বৈশিষ্ট্যে তা সমুজ্জ্বল।

মস্কো ওলিম্পিক্সে সোভিয়েত ইউনিয়নের পরেই জি ডি আর বেশীসংখ্যক প্রতিযোগী পাঠিয়ে প্রায় প্রতিটি বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং ৬৩১টি পদকের মধ্যে ১২৬টি পদক পেয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। মস্কো ওলিম্পিক্সে ২০৩ সেট অর্থাৎ ৬০৯টি পদকের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলেও একই ইভেন্টে একাধিক ব্যক্তি প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয়স্থান অধিকার করায় পদক সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। জি ডি আর পেয়েছে ২০৪টি স্বর্ণ পদকের মধ্যে ৪৭টি, ২০৩টি রৌপ্য পদকের মধ্যে ৩৭টি এবং ২২৪টি ব্রোঞ্জ পদকের ৪২টি।

এই ২২তম গ্রীষ্মকালীন ওলিম্পিক্সে ৩৬টি বিশ্বরেকর্ড হয়েছে। তার মধ্যে ২টি পুরোনো রেকর্ডের সমান এবং ৩৪টি নতুন। এরমধ্যে কেবল জি ডি আর-এর প্রতিযোগীরাই করেছেন ১৪টি। শুধু সাঁতারেই রেকর্ড হয়েছে ১০টি। তার মধ্যে জি ডি আর-এর ৯টি নতুন বিশ্বরেকর্ড। অ্যাথলেটিক্সে ৬টির মধ্যে ২টি, সাইক্লিং-এর ৪টিতে, ২টি শ্যুটিং-এ একটি যুগ্ম রেকর্ড।

এছাড়া অন্য যে সকল বিভাগে জি ডি আর-এর খেলোয়াড়গণ অসাধারণ পারদর্শিতা দেখিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন সেগুলি: পুরুষ ও মহিলাদের রোয়িং। এই বিভাগে তারা ১৪টি স্বর্ণ পদক পেয়েছেন ১৭টি স্বর্ণ পদকের মধ্যে। জিমন্যাস্টিক্সে জি ডি আর এর মেয়ে ম্যাক্সিনক ১টি স্বর্ণ ও ২টি ব্রোঞ্জ পদক পেয়ে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। পুরুষদের হ্যাণ্ডবলে স্বর্ণ এবং মহিলাদের হ্যাণ্ডবলে ব্রোঞ্জ পদক পেলেও ফুটবলে তাদের মণ্ট্রিয়লের খেতাবটি হারাতে হয়েছে চেকোস্লোভাকিয়ার কাছে। আবার ম্যারাথন দৌড়ে মর্যাদার লড়াই-এ জি ডি আর-এর ওয়াল দেমার সিয়েরপিনেস্কী জয়ী হয়ে গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। সেই সঙ্গে অ্যাথলেটিক্সের অন্যান্য বিজয়গুচ্ছিতে কম



৪০০ মিটার দৌড়ে বিজয়ী মারিতা কোচ



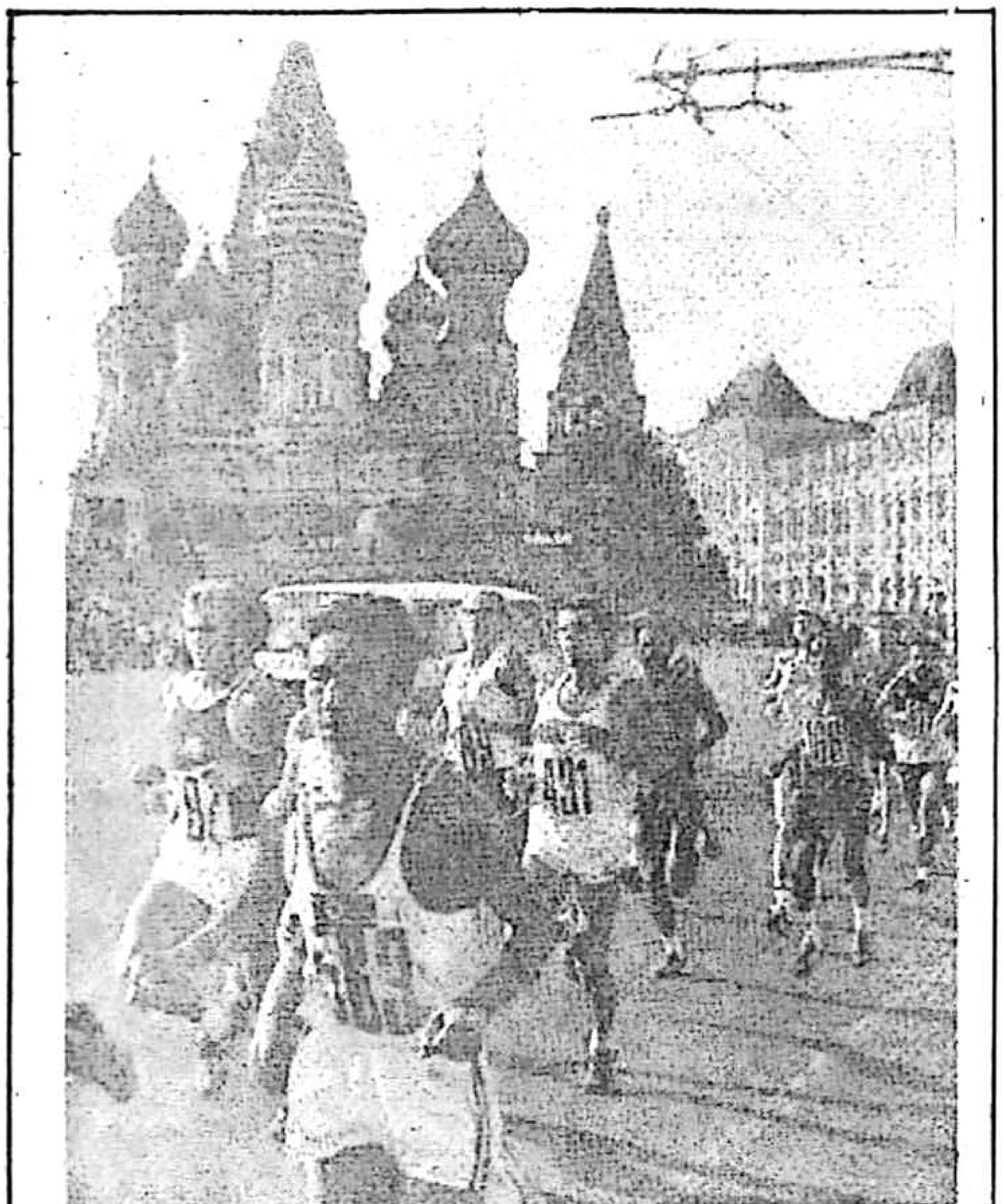
সাইক্লিং-এ বিজয়ী (১০০০ মিটার) লুৎজ হেসলিচ



শটপাটে সোনা পেলেন ইলোনা স্লুপিয়ানেক

১০০০ মিটার কায়াকে চ্যাম্পিয়ন রুডিজ্জার হেম





ম্যারাথন দৌড়বাজরা রেডস্কোয়ারে, জিতলেন ২৯৭ নম্বরের ভাল্ডেমার সিরপিনস্কি

গৌরবান্বিত নয়। যেমন ৫০ কিমি হাঁটা, পুরুষদের ১১০ ও ৪০০ মিঃ, হার্ডলস, লংজাম্প, হাই জাম্প, মেয়ে ২০০ ও ৪০০ মিঃ দৌড়, ৪×১০০ মিঃ রিলে, ডিসকাস ও শটপাটে স্বর্ণ পদক জয়।

তাই এক কোটি ৭০ লক্ষ জনসংখ্যার আয়তনে ১০২তম জি ডি আর আজ বিশ্বের বিস্ময়!

জি ডি আর ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত যুক্ত জার্মান দলের সঙ্গে থেকে এবং পরবর্তী ৪টি ওলিম্পিক্সে আলাদাভাবে যে ওলিম্পিক্স পদক পেয়েছে তার বিবরণ:

গ্রীষ্মকালীন

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
১৯৫৬	১	৪	২
১৯৬০	৩	৯	৭
১৯৬৪	৩	১১	৫
১৯৬৮	৯	৯	৭
১৯৭২	২০	২৩	২৩
১৯৭৬	৪০	২৫	২৫
১৯৮০	৪৭	৩৭	৪২

শীতকালীন

স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
		২
২	১	
২	২	
১	২	২
৪	৩	৭
৭	৫	৭
১	৭	৭

এই ক্রম অগ্রগতি থেকে একথা বোঝা যায় মস্কো ওলিম্পিক্সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানি ও জাপানের মত ক্রীড়া উন্নত দেশ অংশগ্রহণ না করলেও অবনত ক্রীড়া মান নিয়ে জি ডি আর বেশীসংখ্যক পদক পায়নি। রেকর্ড সৃষ্টি করে পদক অর্জন উন্নত ক্রীড়া বৈশিষ্ট্যেরই পরিচায়ক। ছোট দেশ জি ডি আর ক্রীড়া জগতে বেশ বড় আসনই অধিকার করে আছে।





জি ডি ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড বোরোলীন হাউস কলকাতা ৭০০ ০০৩

GD 3160

অযোগ্য ও স্বার্থান্বেষী কর্মকর্তাদের অনুপ্রবেশই প্রধান কারণ

আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছে এবারের বিতর্কের বিষয়টি তুলে ধরার পর বন্ধুটি বেশ সহজভাবেই বলেছিল, 'আমাদের দেশে তো ভাই আঠারো মাসে বছর। এখানে সব কিছুই দেরীতে হয়। দুশো বছরের পরাধীনতার কবল মুক্ত হলাম মাত্র তেত্রিশ বছর আগে। এর মধ্যেই কি আমরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিরাট সাফল্য পেতে পারি? না, পারি না। আরও বেশ কিছু বছর যাক। ভারতবাসীর শুভবুদ্ধি জাগ্রত হোক! তারপর সাফল্য আসবেই। এখন যা কিছু সাফল্য আসছে, আমাদের তা নিয়েই গর্ব করা উচিত।'

আমি প্রশ্ন তুললাম, 'স্বাধীনতা লাভের পর কয়েক বছরের মধ্যেই আমরা বিভিন্ন খেলাধূলায় ভালো ফল করেছিলাম। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমরা মোটামুটি সাফল্য লাভ করেছি। তারপর যতদিন যেতে লাগল, আমরা তত পিছিয়ে পড়তে লাগলাম। এরকমভাবে চললে তো কয়েক বছর বাদে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবো।' উত্তর এল 'সদ্য স্বাধীনতা অর্জন করে তখন আমাদের রক্ত গরম ছিল। দেশের জন্য টান ছিল। যতদিন যেতে লাগল তত টান কমতে থাকল। তবে এভাবে দিন যাবে না।'

আমি আশ্বস্ত হলাম না। এ সান্ত্বনার কোন মূল্য নেই। মনে পড়ে যায় ফেলে আসা দিনগুলির কথা। হকির সেই সোনার দিনগুলোর কথা, অলিম্পিক্স ও এশিয়ান গেমসে ভারতীয় ফুটবলের চমক লাগানো মুহূর্তগুলির কথা, মিলখা সিং-এর অবিস্মরণীয় দৌড়ের কথা, টেনিসে রমানাথন কৃষ্ণান, জয়দীপ মুখার্জি, প্রেমজিৎ-লাল প্রমুখের প্রচেষ্টা, সব এখন স্মৃতির পাতায়। ক্রিকেটের অবস্থা এখন মোটামুটি সন্তোষজনক। বর্তমানে টেনিস, ব্যাডমিণ্টন, বিলিয়ার্ডস, দাবা প্রভৃতি খেলায় ভারতের নাম সবাই জানে প্রধানত বিজয় অমৃতরাজ, প্রকাশ পাড়ুকোন, মাইকেল ফেরেরা, ম্যানুয়েল অ্যারণ ও দিব্যেন্দু বড়ুয়ার ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের জন্য। ডেভিস কাপ বা টমাস কাপে ভারতের ফল বেশীর ভাগ সময়েই শোচনীয় হয়। এছাড়া, ভলিবল, ওয়াটারপোলো, বাস্কেটবল অ্যাথলেটিক্স, জিমন্যাস্টিক্স, সাঁতার প্রভৃতি খেলার মান আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত হতাশব্যঞ্জক। সেই তুলনায় কুস্তির ফল আশাপ্রদ। এককথায়, ভারতের প্রায় প্রতিটি ক্রীড়া বিভাগ এখন গাঢ় অন্ধকারে ডুবে যাছে। সর্বত্র হতাশা ও নৈরাশ্যের প্রতিচ্ছবি।

আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে ভারতীয়দের পিছিয়ে পড়ার কারণ একাধিক। সম্প্রতি নিখিল ভারত ক্রীড়া পরিষদের এক সমীক্ষায় জানা গেছে, 'ষষ্ঠ যোজনাকালে সারা ভারতের খেলাধূলা ও শারীর শিক্ষার জন্য বরাদ্দ হয়েছে সাড়ে সাত কোটি টাকা। এছাড়া প্রতিবছর যোজনা বহির্ভূত ব্যয় ধরা হয়েছে দুই কোটি টাকা। অর্থাৎ দুটি বরাদ্দ হিসাব ধরলে ভারতে প্রতিবছর মাথাপিছু খেলাধূলার জন্য ব্যয় হয় চার পয়সারও কম।'

খবরটি অবিশ্বাস্য মনে হলেও, সত্যি। এই ব্যয় পৃথিবীর যে কোন দেশের তুলনায় সর্বনিম্ন।

ক্রীড়া পরিষদ আরও জানিয়েছে, 'অন্যান্য উন্নতশীল দেশে তাদের ক্রীড়া খাতে ব্যয়ের বড় অংশ আসে বেসরকারী সংস্থা থেকে। স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন সংস্থাগুলিও খেলাধূলার ব্যাপারে বড় অংশ নেয়। কিন্তু ভারতে খেলাধূলার অধিকাংশ দায়-দায়িত্বের জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের উপর নির্ভর করতে হয়।'

হয়তো অনেকেই প্রশ্ন করবেন, 'ভারতের পরে স্বাধীন হয়েছে অথবা জন সংখ্যায় নগণ্য, এমন দেশগুলি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় কিভাবে সাফল্য লাভ করছে?'

জবাবে সমীক্ষা জানাচ্ছে, 'উক্ত দেশগুলিতে আমাদের মত সব খেলার চর্চার রেওয়াজ নেই। তারা যে সমস্ত খেলা খেলছে, তাতেই পুরোপুরি মন-প্রাণ ঢেলে দিচ্ছে। ফলে, ভালো ফলও পাচ্ছে। আমরা সব খেলায় অংশ নিতে গিয়ে কোনোটাতেই ভালো ফল করতে পারছি না। খেলাধূলার জন্য যা অর্থ বরাদ্দ হয়, তা বণ্টন করতে গিয়ে প্রত্যেকের ভাগে সামান্য অংশই পড়ে।'

অসাফল্যের কারণ আরও আছে। আমাদের দেশের ক্রীড়া সরঞ্জামগুলির আধুনিক নয়। দামী ক্রীড়া সরঞ্জাম নেইই বলতে গেলে। সবচেয়ে বড় কথা, যার মাধ্যমে খেলোয়াড় তৈরি হবে, সেই স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও খেলাধূলার সুযোগ খুবই সীমিত। তবে, আমার মতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের পিছিয়ে পড়ার প্রধান কারণ, বিভিন্ন ক্রীড়া বিভাগে অযোগ্য ও স্বার্থান্বেষী কর্মকর্তাদের অনুপ্রবেশ। প্রশাসনিক অনভিজ্ঞতা এবং রাজ্য ও জাতীয় দলের নির্বাচনে পক্ষপাতিত্ব। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় যোগদানের আগে লোক দেখানো মাস খানেক বা তারও কম সময়ের ক্যাম্প হয়। সবচেয়ে মজার কথা, অনবরত কোচ পাল্টানো হয় এবং অযোগ্য কোচরা অগ্রাধিকার পায়। সম্প্রতি কানাডার প্রখ্যাত কোচ জিল.র এক বছর ভারতবর্ষে বক্সিং কোচিং দিয়ে গেলেন। তিনি বাধ্য হয়ে ফিরে গেলেন ভারতীয় কর্মকর্তাদের নোংরামী ও হীনমন্যতা দেখে। শুধু বক্সিং নয়, প্রতিটি ক্রীড়াবিভাগ কুরে কুরে খাচ্ছে এই সমস্ত দেশদ্রোহী কর্মকর্তারা। জানিনা, আরও কতদিন এরা ভারতের খেলাধূলার উন্নতির পথে কাঁটা হয়ে থাকবেন? আরও কতদিন পরে এদের বিষাক্ত নিঃশ্বাস থেকে ভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্র মুক্ত হবে। আশা করব, সুদিন নিশ্চয়ই আসবে। কিন্তু কবে? এর উত্তর বোধহয় স্বয়ং ঈশ্বরও বলতে পারবেন না।

বাদল ভট্টাচার্য, পি-১০৬ যদু পার্ক, বেহালা, কলকাতা-৭০০০৩৪।

সরকারী অবহেলা ও অপদার্থতাই প্রধান কারণ

আন্তর্জাতিক ক্রীড়াতে ভারত সাফল্য লাভ করতে পারছে না কেন? এর কারণ বিশ্লেষণ করতে গেলে প্রথমেই মনে হবে সরকারী অব্যবস্থার কথা। ক্রীড়াক্ষেত্রে দেশে যদি সুষ্ঠু ব্যবস্থা থাকত তবে পাশ্চাত্য দেশগুলির ন্যায় আমরাও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাফল্যের মুখ নিশ্চয়ই দেখতে পেতাম। 'খেলাধূলার সঙ্গে সম্মান জড়িত'— এ ভাবনা যদি দেশের ক্রীড়া কর্মকর্তাদের থাকত তবে বোধ করি স্বাধীনতার তেত্রিশ বছর পরও আমরা এতখানি পিছিয়ে থাকতাম না।

এতদিন খেলাকে চিত্তবিনোদনের উপায় বলেই ভেবেছি, তাই আন্তর্জাতিক আসরে পরাজয় আমাদের গায়ে তেমন লাগেনি। এখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। দিনের পর দিন অন্যান্য দেশগুলি উন্নতি করে চলেছে আর আমরা শুধু পিছিয়েই পড়ছি। সরকারী অবহেলা, অপদার্থতা ও বৈষম্যমূলক আচরণের জন্য ক্রীড়াক্ষেত্রে আমাদের চরম দুর্গতি বলে আমার মনে হয়। একক প্রচেষ্টা ছাড়া কোন ভারতীয় ক্রীড়াবিদই সরকারী অনুদানে সাফল্য লাভ করেছেন বলে আমার জানা নেই। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ওপেনিং ব্যাটসম্যান সুনীল গাভাসকরকে পেয়েছি, মনে হয় ওর ব্যক্তিগত দক্ষতা ও চেষ্টার জন্যই। এর পেছনে সরকারের কোন অবদান নেই। ঠিক এই প্রসঙ্গই প্রকাশ পাড়ুকোন, বিজয় অমৃতরাজ ও মাইকেল ফেরেরার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এই ক'জন ছাড়া আমরা আর বিশেষ কাউকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সফল হতে দেখছি না কেন?

কি করে দেখব? কোন উদ্যোগ আছে? বছরের পর বছর কিছু টাকার অপব্যয় করা হচ্ছে। কিন্তু সম্ভাবনাময় ক্রীড়াবিদদের বিদেশে ট্রেনিং-এ পাঠালে হয়তো দেশের সাফল্য কিছু আসত।

মস্কো অলিম্পিক্স হয়ে গেল, আমাদের দেশের প্রায় পঁচাত্তর জন ক্রীড়াবিদকে পাঠানো হয়েছিল। আমরা ক্রীড়ানুরাগীরা জানতাম, হকিতে সোনা পাওয়া ছাড়া আর কোন বিষয়ে পদক পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। তৎসত্ত্বেও এদের ছাড়পত্র দেওয়া হল কেন। বরং কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য কিছু তরুণ ক্রীড়াবিদদের পাঠানো ভাল ছিল না কি? নইলে অবাকই বা কেন হব না যে জিম্বাবয়ের মত সদ্যস্বাধীন দেশের মেয়ে হকি দলের খেলোয়াড়রা মাত্র ২৫ দিনের কোচিং-এ তাদের দক্ষতা দেখালেন। জানি না এর পরেও আমাদের কর্মকর্তাদের চেতনা আসবে কিনা। কিউবা, ইথেওপিয়া ও আরো অর্থনৈতিক অনুন্নত দেশগুলিই দেখিয়ে দিল যে অলিম্পিক্সে সোনা লাভ করবার প্রত্যাশা ভিত্তিহীন নয়। আর আমরা সামান্য একটি সোনা পেয়েও যা শুরু করেছি তা হাস্যকর ছাড়া আর কিছু নয় (ভাগ্যিস বিশ্বের সেরা দলগুলো যায়নি.)।

স্বাধীনতার তেত্রিশ বছর পরে ক্রীড়া-মন্ত্রণালয় বলে আলাদা আমাদের কোন মন্ত্রক নেই। যে মন্ত্রী শিক্ষা দপ্তর দেখাশোনা করছেন তিনিই ক্রীড়া দপ্তরও আগলাচ্ছেন। এভাবে মনে হয় কোন দেশই কোন একটি দপ্তরের সাফল্য দেখাতে পারে না। হকিতে এর আগে বারংবার পরাজয় সত্ত্বেও এস্ট্রো-টার্ফ আনার আবেদনকে আমাদের ক্রীড়া দপ্তর অগ্রাহ্য করেছেন। বিদেশী প্রথায় বিজ্ঞান সম্মতভাবে অনুশীলন ছাড়া যে ক্রীড়াক্ষেত্রে উন্নতি সম্ভব নয় তা নিয়ে ভাবেনই বা ক'জন? উন্নততর বিদেশী প্রথা অনুকরণ না করে নিজ দেশীয় প্রথা আঁকড়ে ধরে রাখলেই কি দেশপ্রেম হয়? বাইরে থেকে প্রশিক্ষক আনা এবং বিদেশে তরুণ ক্রীড়াবিদদের পাঠিয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করা একান্ত দরকার। আর, ক্রীড়া ক্ষেত্রের উন্নতির জন্য সর্বপ্রথম যেটা দরকার তা হলো অকর্মণ্য, দুর্নীতিপরায়ণ ও অদক্ষ ক্রীড়া প্রশাসকদের সরিয়ে দক্ষতাসম্পন্ন লোকদের স্থান করে দেওয়া।

বিপুল মজুমদার, বালুরঘাট, ঘোষপাড়া, পশ্চিম দিনাজপুর, পিন-৭৩৩১০১

সমস্যাই সমস্যা

আন্তর্জাতিক কোন প্রতিযোগিতায় ভারত ভাল ফল করতে পারছে না। কারণ, স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই ভারত বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। খাদ্য সমস্যা তাদের মধ্যে অন্যতম। ভারতবর্ষের প্রায় ৬৫ কোটি মানুষের ৫৫ কোটিই ভুগছে প্রয়োজনীয় খাদ্যের অভাবজনিত কারণে। এই দেশের মানুষ 'রোটি, কাপড়া আউর মকানে'র চিন্তাতেই দিবানিশি ব্যস্ত থাকে, খেলাধূলার দিকে আগ্রহ দেখাবার মত সময় কোথায়!

পৃথিবীর পাঁচ ভাগের মধ্যে এক ভাগ লোক বাস করে এই ভারতে, মানে শতকরা ২০ জন। একমাত্র চীন ছাড়া অন্যান্য সব দেশই এ ব্যাপারে আমাদের পিছনে। কাজেই বেশির ভাগ দেশেই বিপুল জনসংখ্যার অনুরূপ কোন সমস্যা নেই বললেই চলে। কাজেই ওই সমস্ত দেশের মানুষ খেলাধূলার দিকে ঝুঁকতে পেরেছে বেশি এবং উন্নতিও করেছে (তবে জনসংখ্যা

বেশি হওয়া সত্ত্বেও চীন আমাদের থেকে উন্নত)।

আসলে এদেশের মারাত্মক রোগটি হচ্ছে রাজনীতি। দেশের সর্বময় কর্তারা যদি ইচ্ছা করতেন তাহলেও হয়তো দেশ খেলাধূলায় কিছুটা উন্নতি করলেও করতে পারত। কিন্তু তা কি সম্ভব? চিন্তা করুন যেখানে দিল্লির সিংহাসন দখলের জন্য বা দখল করার পর টিঁকিয়ে রাখার জন্য চলে অবিরাম সংগ্রাম, সেখানকার রাজনৈতিক দাদা, দিদিরা-কি খেলাধূলার কথা ভাবতে পারেন?

এবার ভাবুন খেলাধূলার নিয়ন্ত্রণকারী বিভিন্ন সংস্থাগুলির কথা। তারাও ওই জঘন্য রাজনীতিতেই ব্যস্ত। খেলাধূলার উন্নতি হোক বা না হোক, কোন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষের জয় হোক বা না হোক তাদের কাছে সম্মানের বিষয় হল সম্পাদক, সভাপতি, পরিচালক ইত্যাদি পদগুলি পাওয়া। এরা যদি খেলাধূলা নিয়ে একটু চিন্তা করতেন তাহলে কি এশিয়ান গেমসে, কমনওয়েলথ গেমসে বা অন্যান্য প্রতিযোগিতায় ষষ্ঠ বা সপ্তম স্থানের বদলে একটু ওপরের দিকে ওঠা যেত না? এবার ওলিম্পিক্সেই দেখুন না। যদি 'বয়কট জিন্দাবাদ' না হোত তাহলে ভারত একটা সোনাও কি পেত?

আমার মনে হয়, ভারতে অপদার্থ ক্রীড়া পরিচালকরা এবং হকি সংস্থা নিশ্চয়ই পিছন দিকে মুখ ঘুরে একবার অন্তত বলেছেন, 'বয়কট জিন্দাবাদ।'

আশিস মুখার্জি, মুখার্জি হোটেল, বক্রেশ্বর বীরভূম ৭৩১১৩৪।

অন্যান্য দেশকে দেখেও আমরা শিখি না!

বর্তমান, কোন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় পরাজয় বা ব্যর্থতার পর দেশবাসী পরাজয়ের কারণ হিসাবে সর্বপ্রথমে খেলোয়াড় ও প্রতিযোগীদের নির্দেশ করেই তর্জনী তোলেন। কিন্তু তারা একবারও ভেবে দেখেন কি, এই পরাজয়ের কারণ কি বা কারা? বোধহয় না। প্রশিক্ষকরা বড়জোর দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন—'আরও ভাল ফল আশা করেছিলাম' বা 'আরও ভাল খেলা উচিত ছিল।' আর আমরাও হয়ত তার সমর্থনে খেলোয়াড়দের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দিই বিদ্রূপাত্মক ব্যঙ্গ। কিন্তু, তথাকথিত 'ভাল খেলা' কি গাছের ফল, যে নাড়া দিলেই ঝরে পড়বে! তারজন্য খেলোয়াড়-কর্মকর্তা উভয়েরই মানসিক ও শারীরিক প্রস্তুতি, অক্লান্ত সাধনা, নিষ্ঠা, নিরপেক্ষতা, সততা এবং সর্বোপরি জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রীতি থাকা অপরিহার্য।

খেলাধূলার মানোন্নয়ন করতে আমরা কি করছি? —করছি শুধু অবহেলা। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় এখন যেভাবে দল গড়া হচ্ছে, কোচিং করা হচ্ছে, তা নেহাতই নিয়মরক্ষার তাগিদে, সেখানে আন্তরিকতার ছাপ নেই, নেই সুষ্ঠু পরিকল্পনা। পরিণাম? জিমন্যাস্টিক্সের কথা বাদ দিলাম, বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সের আসরে ভারত এখনও পদকের মুখ দেখেনি। প্রি-ওলিম্পিক্স ফুটবলের কোয়ালিফাইং রাউণ্ডের এশীয় জোনের খেলায় একদা এশীয় চ্যাম্পিয়ন ভারতের স্থান শ্রীলঙ্কার ঠিক ওপরে। হকিতে ভারত ওলিম্পিক সোনা পেল (পাকিস্তান, পঃ জার্মানি, হল্যাণ্ডের অনুপস্থিতিতে) অনেক মেহনত করে। হয়তো নতুন দল, অভিজ্ঞতার পুঁজি তাদের অল্প, এটা একটা কারণ। কিন্তু ভাবতে আশ্চর্য লাগে এতবড় দেশে এখনও একটা অ্যাস্ট্রো টার্ফ বা পলিগ্রাস পীচ পাতা সম্ভব হল না। যেখানে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের ওলিম্পিক্স সফরের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকার অপব্যয় করা হয়েছে। সাঁতার, কুস্তি সাইক্লিং, ওয়েট লিফটিং, ভলিবল প্রভৃতিতেও তথৈবচ অবস্থা।

অপরকে হারাবো, হারাতেই হবে, ওরা পারলে আমি/আমরাই বা পারব না কেন? এরকম দৃঢ় লড়িয়ে মনোভাব আমাদের প্রতিযোগীদের নেই। তাদের সেরকমভাবে উৎসাহিতও করা হচ্ছে না! হচ্ছে হবে এইরকম দায়সারা ভাব সকলের। আজ সবাই যেন আমরা আলস্যে ভুগছি। বর্তমানে কোন প্রতিযোগিতার আগে কিছু প্রতিযোগীকে বাছাই করে ৪০/৪৫ দিনের কোচিং ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিয়ে কর্মকর্তারা দায়মুক্ত হচ্ছেন। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে হলে বহির্বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রতিযোগীদের মানের সঙ্গে পরিচিত হওয়া আবশ্যক। আন্তর্জাতিক মান সম্বন্ধে কোন জ্ঞান না থাকলে প্রতিযোগী কিভাবে নিজেকে তৈরি করবে, আর কিভাবেই-বা বুঝবে কতখানি, কিভাবে কি করলে তার সাফল্য আসতে পারে?

উল্লেখ্য, সম্প্রতি একটি রুশ ভলিবল দল আমাদের দেশে পাঁচটি টেস্ট ম্যাচ খেলেছে। তারা ক্রমান্বয়ে আরও কয়েকটি দেশ সফর করবে। সুদূর ১৯৮৪-র ওলিম্পিক্সের জন্য এই প্রস্তুতি। এর থেকে বোঝা যায়, অন্যান্য দেশ খেলাধূলায় কত সচেতন এবং তাদের সঙ্গে আমাদের প্রস্তুতির ধারার পার্থক্য কোথায়।

রাশিয়া, আমেরিকা, পূর্ব জার্মানি, পশ্চিম জার্মানি প্রভৃতি খেলাধূলায় উন্নত দেশগুলিতে ৬/৭ বছর বয়স থেকে শিশুদের খেলাধূলার প্রতি যত্ন নেওয়া হয়। তাদের শারীরিক গঠন অনুযায়ী অনুশীলন ও দৈনন্দিন খাদ্য তালিকা তৈরি হয়। পড়াশুনার ক্ষেত্রেও যার যেদিকে প্রবণতা, তাকে সেইভাবে সুযোগ দেওয়া হয়। পড়াশুনার সঙ্গে শরীর গঠনের জন্য খেলাধূলারও সমান প্রয়োজন। 'হেলথ ইজ ওয়েলথ' এই প্রবাদ বাক্যটিকে শুধু কথায় নয়, তারা কার্যে রূপায়িত করে।

সবশেষে আমি নির্বাচকদের পক্ষপাতিত্ব সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করছি। যেখানে জাতীয় স্বার্থ ও সম্মান জড়িত, ব্যক্তিগত বা দলগত আক্রোশ বর্জন করাই সেক্ষেত্রে সুবুদ্ধির পরিচায়ক। কিন্তু, আজ অধিকাংশ কর্মকর্তাই দলাদলি ও অন্তর্কলহে লিপ্ত, যার শিকার খেলোয়াড়রা। প্রমাণ? —আসলাম শের খাঁর মত হকি প্রতিভার অকালে বিদায় গ্রহণ। এরকম নজীর আরও অনেক আছে।

এইসব হীন, ঘৃণ্য মনোবৃত্তি ও প্রতিকূলতাকে জয় করা মোটেই অসম্ভব নয়। তা সম্ভব হলেই আমরা সাফল্য সম্বন্ধে আশান্বিত হতে পারি। সেই সুদিনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে রইলাম।

শিলাদিত্য সোম, ৭/৩, রামনাথ বিশ্বাস লেন, সাহা হাউস, ফ্ল্যাট নং-১৬, কলকাতা-৯।

ভাল ফল করতে হলে

মস্কো ওলিম্পিক্স থেকে মাত্র একটি পদক নিয়ে ৬০ কোটির ভারতের ৭৫ জন প্রতিযোগী দেশে ফিরেছেন। সবেধন নীলমণি পদকটি জুটেছে হকিতে। ভারতীয়দের ভাগ্য ভালই বলতে হবে। কারণ মস্কোর ভিকট্রি স্ট্যাণ্ডে তাদের পদচিহ্ন পড়েছে। অবশ্য অনেকে বলেছেন 'ওলিম্পিক্স বয়কট' না হলে হয়তো এটাও জুটত না কারণ আধুনিক হকির প্রথম সারির পাঁচটি দেশ পাকিস্তান, নিউজিল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, হল্যাণ্ড ও পশ্চিম জার্মানি অনুপস্থিত। সত্যি এর চেয়ে লজ্জার, দুঃখের আর কিছু নেই।

মস্কোর ফল দেখে অন্য কোন দেশের দিকে তাকাবার প্রয়োজন নেই, তাকিয়ে দেখুন কেবলমাত্র কিউবা, ইথিওপিয়া প্রভৃতি ছোট ও অনুন্নত দেশগুলির দিকে। দূরপাল্লার দৌড়ে আবেবে বিকিলা তো কিংবদন্তী, মামো ওল্ডোও বিখ্যাত এবার আর এক ইথিওপিয়ান মিরাৎস ইফতার পাঁচ হাজার ও দশ হাজার মিটার দৌড়ে সোনা জিতে ওলিম্পিক্স কাঁপিয়ে দিলেন।

এবার তাকান আমাদের দেশের দিকে। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অধিকাংশ প্রতিযোগী সাধারণত হিটেই বিদায় নেন। কেন? এর উত্তর অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকের অভাব ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণের অভাব। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার জন্য যে ধরনের প্রশিক্ষণ দরকার তা এদেশীয় মান্ধাতার আমলের প্রশিক্ষকদের দ্বারা সম্ভব নয়। তারা যা জানে তাই এখনও প্রতিযোগিদের শেখাচ্ছে। তাছাড়া আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে নিজেরাই যারা যথেষ্ট ওয়াকিবহাল নন তারা কি করে প্রতিযোগীদের শেখাবেন। তাছাড়া কোন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণের পূর্বে নামমাত্র কিছুদিনের প্রশিক্ষণই যথেষ্ট নয়।

পরিশেষে ভারত সরকার ও ক্রীড়া কর্মকর্তাদের কাছে বলি, আপনাদের উচিত রাজনীতির কোন্দল থেকে মুক্ত হয়ে, পদমর্যাদার লোভ ত্যাগ করে প্রতিযোগীদের দিকে সহমর্মী দৃষ্টিপাত করে, বিদেশ থেকে আধুনিক অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক এনে নিয়মিত ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করুন। তাছাড়া কয়েকজন এদেশীয় প্রশিক্ষককে রাশিয়া, পূর্ব জার্মানি ও আমেরিকার মত উন্নত দেশগুলিতে উচ্চতর প্রশিক্ষণ লাভের জন্য পাঠানোর ব্যবস্থাও করা হোক। নতুবা ১৯৮২-র এশিয়ান গেমসে উদ্যোক্তা দেশ হিসাবেই ভারতকে লজ্জা পেতে হবে।

উজ্জ্বল দত্ত, বক্রেশ্বর, জেলা-বীরভূম। পিন-৭৩১১৩৪

কোন্দল বন্ধ করে এক হয়ে কাজ করা প্রয়োজন

আধুনিক উন্নত দেশগুলিতে আন্তর্জাতিক খেলাধূলার মান যত অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে, সেই তুলনায় ষাটের দশকের চেয়েও আশির দশকে আমরা অনেক পেছনে পড়ে আছি। একথা অকপটে একবাক্যে সকলেই স্বীকার করবেন। এখন আমাদের খতিয়ে দেখার প্রয়োজন, বিভিন্ন খেলাধূলার ক্ষেত্রে কেন এমন চরম ব্যর্থতা এবং আমাদের উন্নতির প্রধান অন্তরায়গুলি কোথায়?

প্রথমত রাশিয়া, আমেরিকার মত দেশে খেলাধূলায় উন্নতির জন্য কর্মসূচী নেওয়া হয় ছেলেমেয়েদের বয়স যখন আট দশ বছর। এইসব দেশে লেখাপড়ার সঙ্গে খেলাধূলার দিকটা সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়। আর সেখানে আমাদের দেশে নামমাত্র শরীর চর্চা ও খেলাধূলার প্রবর্তন হলেও একবার চোখ খুলেও কেউ দেখেন না কোন উন্নতি হচ্ছে কিনা। সব পরিকল্পনাই ওদের বিজ্ঞানভিত্তিক আর আমাদের জগা খিচুড়ি।

দ্বিতীয়ত আমাদের দেশে যে রাজনৈতিক দলই সরকারী ক্ষমতায় আসুক না কেন, খেলাধূলার প্রসঙ্গটা আদৌ সু-দৃষ্টিতে দেখেন না। আধুনিক যুগে যেখানে অন্যান্য দেশ বিজ্ঞানভিত্তিক পরিকল্পনার মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে চলেছে দেশের গৌরব বৃদ্ধির তাগিদে, সেখানে আমাদের দেশের পরিকল্পনা শুধুমাত্র নিছক পত্র পত্রিকাতেই সীমাবদ্ধ।

তৃতীয়ত বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থাগুলির মধ্যে গোষ্ঠী কোন্দল, স্বজন-পোষণ নীতি এমনভাবে প্রসার লাভ করেছে যে এহেন ছোঁয়াচে রোগের কবলে পড়ে বহু সম্ভাবনাময় প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদ, খেলাধূলার জগত থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হচ্ছেন।

পরিশেষে এ আই এফ এফ আই এইচ এফ ইত্যাদির বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থার, দিনের পর দিন বিভিন্ন সভা সমিতিতে, শুধুমাত্র বাগ-বিতণ্ডা আর নানাপ্রকার কথার ফুলঝুরি আউড়েই ক্ষান্ত থাকছেন যারা; তারা যদি ওই শীতাতপনিয়ন্ত্রিত দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শুয়ে, আর পূতিগন্ধময় রাজনীতির আবর্তের মধ্য থেকে বিচিত্র রঙীন স্বপ্ন না দেখে ঐক্যবদ্ধ সুসংহত অভিনব প্রয়াস নেবার চেষ্টা করেন তবেই আমরা মেঘাচ্ছন্ন ক্রীড়াকাশে নতুন আলো দেখতে পাব।

শৈলেন্দ্রনাথ রায়, সাং-শিলবেড়িয়া, পোঃ-উল্লাসী, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪১৫০২।

(এবারের বিতর্কে কুড়ি টাকা পুরস্কার পাবেন শিলাদিত্য সোম)

শিলিগুড়ির ফুটবল লিগ

নিজস্ব প্রতিনিধি

শিলিগুড়ি প্রথম বিভাগীয় ফুটবল লিগে এবছরে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে গ্লোব টর্টাস স্পোর্টিং ক্লাব (জি টি এস) এবং রানার্স কিশোর সংঘ। এবছরের লিগে অংশ নিয়েছিল মোট ১৫টি দল। দুটি গ্রুপে খেলা হয়েছে। দুটি গ্রুপের শীর্ষস্থানীয় ৩টি করে দল নিয়ে সুপার লিগ খেলা হয়। লিগ যাতে ভালভাবে শেষ হতে পারে তারজন্য সমস্ত রকম নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। স্থানীয় কয়েকজন রেফারির উপর ভরসা করে খেলা চালানোর ঝুঁকি নিয়েও ক্রীড়া নিয়ামক সংস্থাকে (এস এস এ) শেষ পর্যন্ত কলকাতার রেফারি দিয়ে খেলা পরিচালনা করতে হয়। একটি খেলাতে অংশগ্রহণ করেছেন। সর্বাধিক গোল করেছে বাঘাযতীন ক্লাব (১১টি), সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে। শেষোক্ত দল এবছরে একটিও পয়েন্ট সংগ্রহ করতে পারেনি।

সুপার লিগে খেলবার সুযোগ পেয়েছিল গ্লোব টর্টাস, কিশোর সংঘ, দেশবন্ধু স্পোর্টিং ক্লাব ইউনিয়ন, বিবেকানন্দ ক্লাব, মহানন্দা স্পোর্টিং ক্লাব এবং সরোজিনী সংঘ। সুপার লিগের ১৫টি খেলার মধ্যে হয়নি ৪টি। অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে ১টি খেলা। মোট গোল হয়েছে ৩৮টি। হলুদ কার্ড দেখেছে দেশবন্ধু ক্লাবের দীপঙ্কর মজুমদার, গ্লোব টর্টাস দলের গৌতম সাহা। একটি খেলায় সর্বাধিক গোল হয়েছে—বিবেকানন্দ



চ্যাম্পিয়ন ক্লাব। ছবি: তপন দাস

লিগের বেশ কয়েকটি খেলা অনুষ্ঠিত হয়ে যাবার পর কয়েকটি খেলাতে ছোটখাট অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। এবছরের লিগে ৪৯টি খেলার মধ্যে ৮টি খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। খেলা হয়নি ৭টি। মোট গোল হয়েছে ১৩৭টি। লিগে হ্যাটট্রিক হয়েছে ৩টি, করেছে বাঘাযতীন ক্লাবের দুলু দাস, এন আর আই দলের তুহীন চৌধুরী, অগ্রগামী দলের বোরলী গুপ্তা। গোলশূন্য অবস্থায় খেলা শেষ হয়েছে একটি। মজার ঘটনা, সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাবের এক খেলোয়াড় বুট পায়ে না দিয়েই দল ৫ মহানন্দা স্পোর্টিং ২। সুপার লিগে একটি মাত্র হ্যাটট্রিক হয়েছে, করেছেন কিশোর সংঘের সাধন মুখার্জি। লিগে অংশগ্রহণকারী দলগুলির মধ্যে ছিল গ্লোব টর্টাস স্পোর্টিং ক্লাব, দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউঃ, নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে ইনস্টিটিউট, মিলন পল্লী স্পোর্টিং ক্লাব, বাঘাযতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব, সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাব, কিশোর সংঘ, মহানন্দা স্পোর্টিং ক্লাব, বিবেকানন্দ ক্লাব, রবীন্দ্র সংঘ, অগ্রগামী সংঘ, ইয়ংম্যানস অ্যাসোসিয়েশন, নবীন সংঘ, উপকার অ্যাথলেটিক ক্লাব।

২৪ পরগণা অন্তঃমহকুমা ফুটবলে



খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন আই এফ এ সম্পাদক অশোক মিত্র। ছবি: নিমাই ঘোষ

সুন্দরবনের সংবাদদাতা। উত্তর ২৪ পরগণার আন্তঃমহকুমা ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা বসিরহাট হাই স্কুলের মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। ২৪ পরগণার ১২টি দল এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। ফাইনাল খেলায় বসিরহাট মহকুমা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন এবং ব্যারাকপুর মহকুমা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনকে যুগ্ম বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। উভয় দলই একটি করে গোল দেয়। বসিরহাট মহকুমার পক্ষে বিমল ঘোষ এবং ব্যারাকপুরের পক্ষে বিজয় পাল গোল করেন। খেলায় উপস্থিত ছিলেন আই এফ এ-র সম্পাদক অশোক মিত্র।



ফাইনালিস্ট দুটি দল

জাতীয় বাস্কেটবলে আসাম

সংবাদদাতা: নওগাঁ (আসাম)— সম্প্রতি নওগাঁতে আসাম বাস্কেটবল সংস্থার সভায় এই বৎসর আসাম রাজ্য বাস্কেটবল দলের জুনিয়র ও সিনিয়র বিভাগের (পুরুষ ও মহিলা বিভাগে) জাতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় যোগদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জুনিয়র (বালক ও বালিকা এবং) সিনিয়র (পুরুষ ও মহিলা) জাতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা এবার যথাক্রমে জামশেদপুর ও ইন্দোরে হবে।

আসাম বাস্কেটবল সংস্থার সাধারণ সম্পাদক রাজেন বরকাকতি অভিযোগ করেন, রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদ ফুটবল, ক্রিকেট ও টেবিল টেনিসের কোচিং ইত্যাদির ব্যাপারে অকাতরে অর্থ ব্যয় করলেও বাস্কেটবলের ব্যাপারে অর্থ সাহায্য বিশেষ করে না।

শ্রীবরকাকতি আরোও বলেন, বর্তমানে আসামে বাস্কেটবল বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু দক্ষ কোচের অভাবে বালক-বালিকারা প্রকৃত প্রশিক্ষণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

উল্লেখযোগ্য, নওগাঁর একজন প্রাক্তন বাস্কেটবল খেলোয়াড় দুবছর যাবৎ নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউট থেকে বাস্কেটবল কোচিং দক্ষতার সঙ্গে পাশ করেও বেকার বসে আছেন। অথচ বর্তমানে আসামে, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত একজনও বাস্কেটবল কোচ নেই।



কার্টুন: আলি

১০ ও ৫ কিমি রোড রেস



১০ কিলোমিটার রোড রেসে বিজয়ী সি আর পি এফ-এর জয় উল্লাস।

সম্প্রতি নওগাঁ নেহরু যুবক কেন্দ্র আয়োজিত ১০ কিমি এবং ৫ কিমি 'রোড রেস'-এ বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে সম্পন্ন হয়।

দলগত প্রতিযোগিতায় ১০ কিমি ও ৫ কিমি দৌড়ে যথাক্রমে ৬২ নম্বর ব্যাটেলিয়ান সি আর পি এফ দল এবং নওগাঁ বাস্কেটবল গ্রুপ বিজয়ীর সম্মান লাভ করে। ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতায় '১০ কিমি দৌড়ে ১ম এম বিড়লা (সি আর পি এফ), ২য় অসীম ভট্টাচার্য (ইয়ুথ ক্লাব) ও ৩য় এফ সি খজুর (সি আর পি এফ) এবং ৫ কিমি দৌড়ে ১ম প্রদীপ দাস (পানীগাঁও বয়েজ ক্লাব), ২য় রতন লাল চৌহান (নওগাঁ বাস্কেটবল গ্রুপ) ও ৩য় টঙ্কেশ্বর বরা (নওগাঁ বাস্কেটবল গ্রুপ) জয়লাভ করেন।

শব্দ জব্দ

দিলীপ দাস
দ্বাদশ শ্রেণী (বিজ্ঞান)
উদয়পুর রমেশ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়,
পোঃ রাধাকিশোরপুর, ত্রিপুরা।

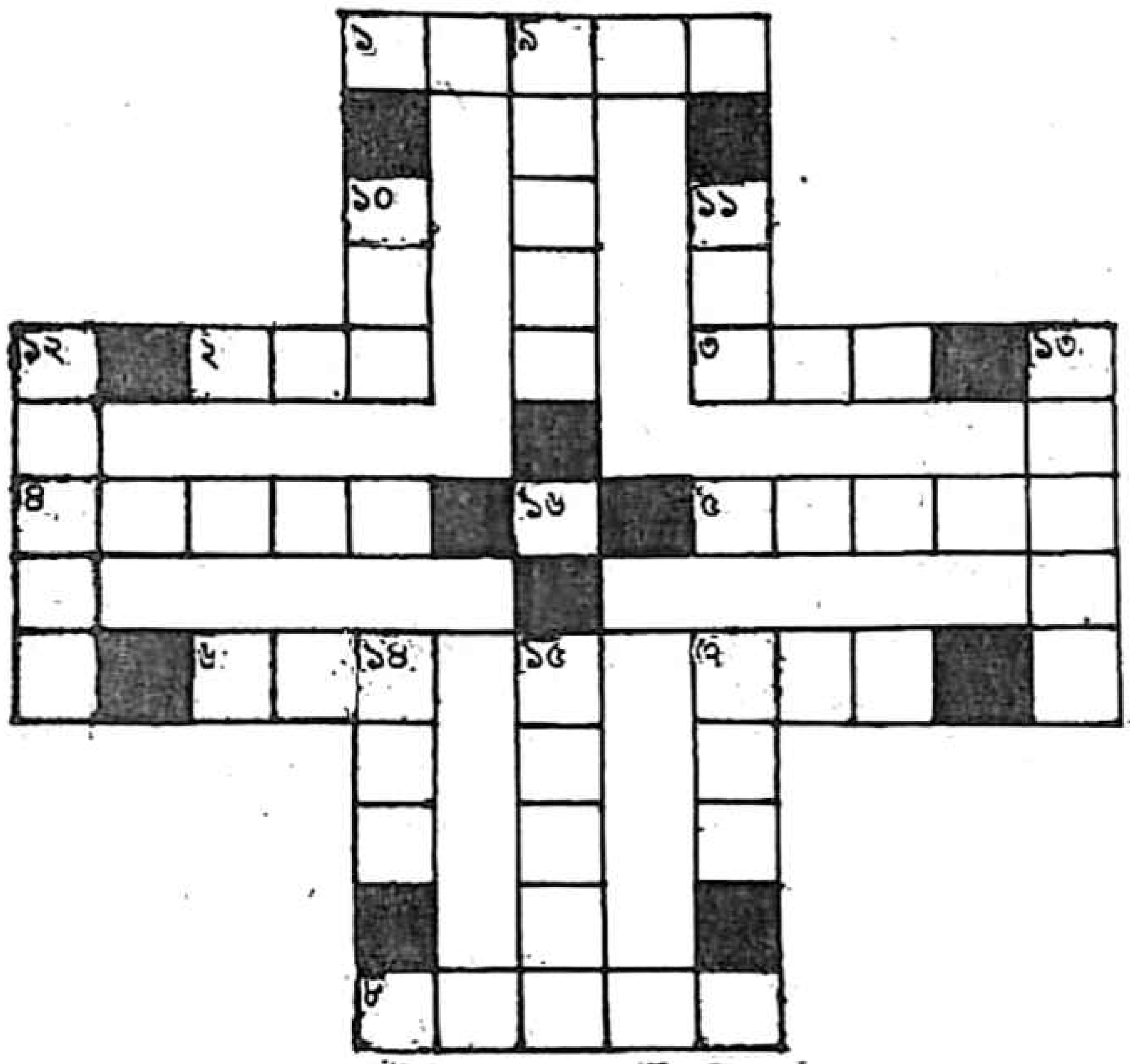
পাশাপাশি

১। মস্কো অলিম্পিক্সে মেয়েদের হকিতে চতুর্থ স্থান পাওয়া দেশের অধিনায়িকা।

২। গত বিশ্বকাপ ফুটবলে একটি ম্যাচ না হেরেও তৃতীয় স্থান দখল করেছিল এই দেশটি।

৩। মস্কো অলিম্পিক্স ফুটবলের ফাইনালে ওই খেলোয়াড়ের গোলে চেকোশ্লোভাকিয়া সোনা জিতেছিল।

৪। এই সোভিয়েত শ্যুটার বিশ্বরেকর্ড করে রুশ দলের পক্ষে প্রথম সোনা জেতেন মস্কো অলিম্পিক্সে।



৫। '৮০-র অলিম্পিক্স পদক প্রাপ্তির তালিকায় এই দেশের স্থান তৃতীয়।

৬। মস্কো অলিম্পিক্সে বিশ্ববাসীকে বিস্মিত করে মহিলাদের জিমন্যাস্টিক্সে অলরাউণ্ড চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন এই রুশ অষ্টাদশী।

৭। এবারের অলিম্পিক্স ফুটবলের সর্বোচ্চ গোলদাতা।

৮। সদ্য সমাপ্ত মস্কো অলিম্পিক্সে মেয়েদের ১৫০০ মিটার দৌড়ে সোনা জিতেছেন এই অ্যাথলিট।

উপর নীচ

৯। মস্কো অলিম্পিক্সে ১৫০০ মিটার ফ্রিস্টাইল সাঁতারে সোনা জয়ী রুশ তরুণ।

১০। আগামী অলিম্পিক্সের প্রতীক।

১১। গত বিশ্বকাপ ফুটবলে সবচেয়ে সফল ফরোয়ার্ড।

১২। গত বিশ্বকাপ ফুটবলে রেকর্ড সৃষ্টিকারী গোলরক্ষক সম্প্রতি এক মোটর দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিলেন।

১৩। এবারের অলিম্পিক্সে সব মিলিয়ে ৮টি পদক জিতে বিশ্ব রেকর্ড করেছেন এই রুশ জিমন্যাস্ট।

১৪। মস্কো অলিম্পিক্সে জিমন্যাস্টিক্সের টপ ফেভারিট ছিলেন এই অষ্টাদশী জিমন্যাস্ট, শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় স্থান পেয়েছেন।

১৫। '৫৮-র বিশ্বকাপ ফুটবলে ১৩টি গোল করেছিলেন ফ্রান্সের এই ফুটবলার।

১৬। মস্কোয় পুরুষদের মাঝারি পাল্লার দৌড়ে (১৫০০ ও ৮০০ মিটার) সোনা জয়ের অন্যতম দাবীদার ছিলেন ব্রিটেনের এই অ্যাথলিট।

১৭। এবার অলিম্পিক্সে ছেলেদের হকিতে একটি হ্যাটট্রিক সহ গোল (সর্বোচ্চ) করেছেন এই বর্ষীয়ান স্প্যানিশ খেলোয়াড়।

উত্তর

পাশাপাশি

১। রূপা সাইনি, ২। ব্রাজিল, ৩। সবোদা, ৪। মেলেনতেভ, ৫। বুলগেরিয়া, ৬। ইলেনা, ৭। আন্দ্রিভ, ৮। কাজানকিনা।

উপর নীচ

৭। আমাত, ৯। সালনিকভ, ১০। ঈগল, ১১। কেম্পেস, ১২। প্যোপমেয়ার, ১৩। দিত্তিয়াতিন, ১৪। নাদিয়া, ১৫। ফনটাইন, ১৬। কো।

ধাঁধার উত্তর

১। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও ডেনমার্ক।
২। ১৯৩০।
৩। ১৯২৮ সালের অলিম্পিক্সে প্রদর্শনী ম্যাচ হয়।
৪। গোয়ালিয়র।
৫। জয়ন্ত ভোরা।
৬। মেক্সিকো, ১৯৬৮।
৭। বাংলার প্রেমাংশু চ্যাটার্জি, আসামের বিরুদ্ধে ১৯৫৬ সালে।
৮। ৮৭ কিলোমিটার।



এক্ষুনি লাগান বার্নল—
পুড়ে যাওয়া জখমের
আসল চিকিৎসা!



পোড়ার জখমের সঙ্গে অন্যান্য জখমের অনেক তফাৎ। পুড়ে যাওয়ার জ্বালা তীব্র যন্ত্রণাদায়ক। আর পোড়া থেকে ফোস্‌কাও পড়ে। এর জন্যে আপনার দরকার পোড়ার জখমের আসল চিকিৎসা—বার্নল অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীম। বার্নল নিমেষে জ্বালা উপশম করে স্নিগ্ধ করে আর ফোস্‌কাও পড়তে দেয় না। পোড়ার জখম শীঘ্র উপশম করার সব-কটি উপাদানই বার্নলে রয়েছে।

সবসময়ে ঘরেতে রাখুন বার্নল।

বার্নল
পুড়ে যাওয়া জখমের আসল চিকিৎসা।

BC.5641

বৈদ্যনাথ
চ্যবনপ্রাশ



- প্রকৃতি-জাত ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ
- সর্দিকাশি হতে দেয় না
- ক্যালসিয়ামের অভাব এবং রক্তাল্পতায় কাজ দেয়
- অবসাদ ও ক্লান্তি দূর করে
- যৌবনসুলভ শক্তি যোগায়
- কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লরোগ ও বদহজমে কার্যকরী
- আমলকি ও গাছগাছড়ার দ্বারা তৈরী বলে এটি সুপরিপাচ্য

বৈদ্যনাথ সর্বব্যবস্থা সমন্বিত ৫টি আধুনিক কারখানায় ৭০০টিরও বেশি আয়ুর্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত করে ও দেশের বাইরে রপ্তানী করে।

বৈদ্যনাথ আয়ুর্বেদীয় ঔষধ ৮০০টি বিক্রয়কেন্দ্র ও ৬০,০০০ ডিলারের মাধ্যমে দেশের ও বিদেশের সর্বত্র পাওয়া যায়।

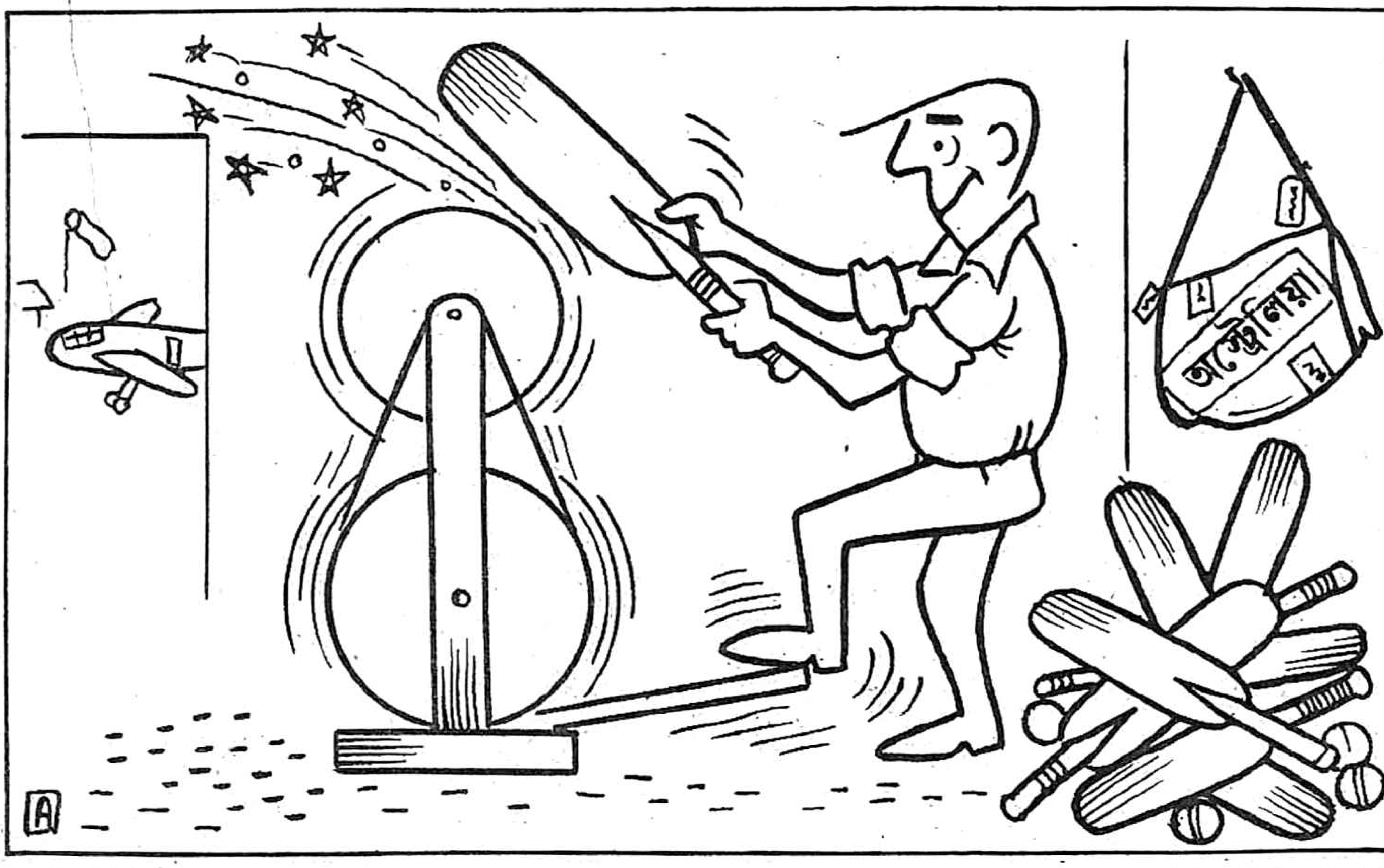
বড় প্যাকের সঙ্গে বিনামূল্যে চামচ

শ্রী **বৈদ্যনাথ** আয়ুর্বেদ ভবন লিমিটেড
কলিকাতা ● পাটনা ● ঝাঁসী ● নাগপুর ● এলাহাবাদ

পরিবারের জন্য আয়ুর্বেদীয় টনিক

naa.BAB-8061A

বাঁকা চোখে



কার্টুন : আলি

টক মিষ্টি ঝাল

অস্ট্রেলিয়া যাব বলে
দিচ্ছি ব্যাটে ধার,
কাটবো নাকো কোন কিছু
মারবো ছক্কা আর চার।
নতুন কটি ছেলে নিয়ে
যাচ্ছি এবার বিদেশে
খেলতে যদি না পারে তো
ক্যাঙারুরা হাসবে শেষে ।।

আলি

★

রেহাই

'হ্যাঁরে পূর্বাঞ্চল থেকে ক্রিকেটে নির্বাচক কে রে ?' চায়ের টেবলে বসে এক বন্ধু অন্য জনকে প্রশ্ন করে।

'দাতু ফাদকার' একজনের উত্তর।

'খুব জানে, পঙ্কজ রায়' অন্য জনের সিদ্ধান্ত।

'না'

'হ্যাঁ'

'যাক যেই হোন না কেন। তিনি বেশ খোশমেজাজে এবারে নির্বাচনী সভায় গিয়েছিলেন। কারণ অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যাণ্ড সফর করবার জন্য পূর্বাঞ্চলের, বিশেষ করে বাংলার এমন কেউ ছিল না যার জন্য তিনি সুপারিশ করতে পারেন। খুশী খুশী মুখ করে ভদ্রলোক আমাকে বললেন—'গত বছরও কিছুটা মুস্কিলে পড়েছিলাম এবারে ওরা হেরে হেরে আমাকে ঝাড়া হাত পা করে দিয়েছে।'

'সে কি তুই তো তার সঠিক নামও জানিস না।'

'তাতে কি—আমার সঙ্গে কথা হয়েছে স্বপ্নে—' বলতে বলতে চৌকস বক্তা আড্ডা ছেড়ে বেরিয়ে গেল।



★

রাবার



বিদেশ যাচ্ছে আবার,
নিয়ে এসো রাবার।
ঘসবো বুকে কষে
সবাই মিলে মিশে।
'খেলায় সবার পিছে'
এ'দুঃখ যাবে মুছে।

পকুদা

ছবি এঁকেছেন—সন্তোষ গুপ্ত

মাদ্রিদে বিশ্বকাপ ফুটবল ঃ রাজসূয় আয়োজন চলছে



ফুটবলের আগামী বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতা শুরু হতে আর বিশেষ বাকি নেই, হাতে দু'বছরেরও কম সময়। তবে স্পেন ইতিমধ্যেই বেশ ভালভাবে প্রস্তুতি পর্বের কাজ এগিয়ে নিয়ে চলেছে, যা দেখে ফিফা সভাপতি জোয়াও হ্যাভেলাঞ্জ বিরাট স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন।

'৭৮-এ আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপের ভারী চমৎকার আয়োজন করেছিল, কিন্তু সুব্যবস্থার প্রায় সব কিছুই ঘটেছে প্রায় শেষ মুহূর্তে, অতএব সহজেই বোঝা যায় 'ফিফা'-কে কি ধরনের অস্বস্তি আর সংশয়ের মধ্যে কাল কাটাতে হয়েছিল। আর '৮৬-তে যে বিশ্বকাপ কলম্বিয়াতে হওয়ার কথা প্রায় ঠিক। তাদের নিয়েও দুশ্চিন্তা এখন থেকেই শুরু হয়ে গেছে। আর্জেন্টিনার মত তারাও শেষ রক্ষা করতে পারবে কিনা সেটাই এখন আলোচনার বিষয়। আবার '৯০ আর '৯৪-এর বিশ্বকাপের আয়োজনের দায়িত্ব নেবার ইচ্ছে ইতিমধ্যেই প্রকাশ করেছে ব্রাজিল ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। তাদের ইচ্ছে যদি পূর্ণ হয় তবে 'ফিফা কাপ' প্রতিযোগিতা দীর্ঘকাল ইউরোপের বাইরে থাকবে।

হ্যাভেলাঞ্জ সম্প্রতি বলেছেন, স্পেন এর মধ্যেই এতটা প্রস্তুত যে, যদি বলা হয় আগামীকাল থেকে প্রতিযোগিতা শুরু করতে হবে, তবে তাও তাদের পক্ষে অসম্ভব হবে না।

এ ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে যা যা লাগে স্পেনের তার প্রায় সব কিছু ব্যবস্থাই আগে থাকতে আছে। ট্যুরিস্ট আকর্ষণের জন্য স্পেনের হোটেল ব্যবস্থা অনেকদিন ধরেই বেশ ভালরকম। টেলিভিসনের ব্যবস্থার হয়তো আরো কিছু উন্নতি প্রয়োজন, তবে তাতে কোন অসুবিধে হবে না, কারণ বর্তমানের উত্তম ব্যবস্থাকে 'অতি উত্তম' করাটা কষ্টকর হবে না। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কাজও এগোচ্ছে। রেল আর বিমান ব্যবস্থা আরেকটু ছিমছাম আর দ্রুতগতি করবে। সবচেয়ে বড় কথা স্পেনে বিশ্বকাপের উপযোগী স্টেডিয়াম নিয়ে নতুন করে মাথা ঘামানোর বিশেষ কিছু নেই, কারণ তা আগে থাকতেই আছে। তারই মধ্যে দু'একটি ক্ষেত্রে একটু আধটু রদবদল করতে হবে। একটাই মাত্র নতুন স্টেডিয়াম হচ্ছে ভাল্লা ডোলিড-এ।

কোন্ খেলা কোথায় কখন হবে তার একটি পূর্ণ তালিকা স্পেনের আয়োজক কমিটি ফিফাকে দিয়েছে। এবারের ১৬টির জায়গায় ২৪টি দল ফাইনাল রাউণ্ডে খেলবে। খেলা হবে ১৪টি শহরের ১৬টি মাঠে। প্রারম্ভিক খেলা হবে রাজধানী বার্সিলোনায়। প্রথম ম্যাচেই অংশ নেবে গতবারের চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা, শেষ অর্থাৎ ফাইনাল ম্যাচ হবে রিয়েল মাদ্রিদের বার্নাবু স্টেডিয়ামে। বার্সিলোনা স্টেডিয়ামে ৯০ হাজার দর্শক খেলা দেখতে পারে, সেটাকে বাড়িয়ে ১ লাখ ১৫ হাজার দর্শকের উপযোগী করা হয়েছে, বেসরকারী হিসাবে আরো বাড়তি হাজার পনের দর্শকের জায়গা হয়ে যাবে। অপরদিকে মাদ্রিদের স্টেডিয়ামে আসন সংখ্যা ১ লাখ থেকে কমিয়ে ৯০ হাজারে আনা হয়েছে, সাংবাদিকদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গাটা আরো বাড়াতে। ১৬টি স্টেডিয়ামের এইসব খরচ খরচা মেটাতে লাগবে প্রায় ৩২ কোটি টাকা। জানা গেছে যে সাংবাদিক এবং টি ভি ও রেডিওর টেকনিশিয়ান মিলিয়ে মোট প্রায় হাজার পনের লোক উপস্থিত হবেন স্পেনে।

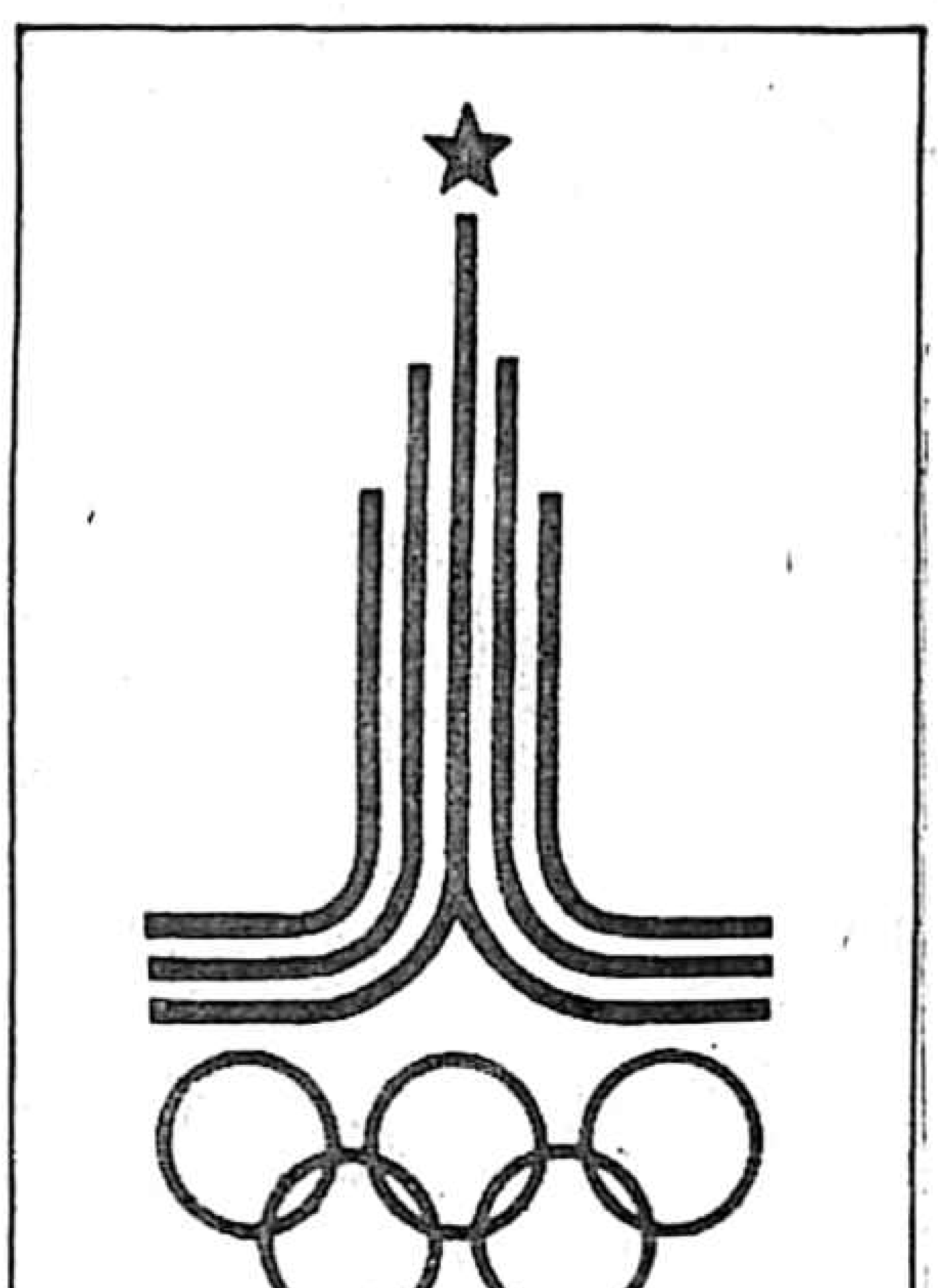




SPORTS LOVERS !

Watch out for

MOSCOW 80



A full record of the XXII Olympic Games

Breathtaking photographs
Comprehensive reports
All the results

GOOD LUCK TO ALL PARTICIPANTS OF THE GAMES OF THE XXII OLYMPIAD!





ITYADI PRAKASANI (PVT.) LTD, 47 Biplabi Anukul Chandra Street, Calcutta 700 072.

উবাচ

মস্কোয় পুরুষ হকি খেলোয়াড়দের উৎসাহ দিতে এবং সমর্থন জানাতে আমরা মেয়েদের পুরো হকি দলকে মাঠে না পাঠাতাম, তবে দলের কর্মকর্তারা এবং সমাগত স্বার্থান্বেষীরা আমাদের অসহযোগিতার অপবাদ দিতেন। পুরুষ হকি দলকে সমর্থন জানাবার জন্য চিৎকার চেঁচামেচি করে মেয়েরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। বেশি চিৎকার করেই তারা ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছিল।

—কোচ কর্তার সিং

* *

ষষ্ঠ যোজনাকালে সারা ভারতের খেলাধূলা ও শারীর-শিক্ষার জন্য বরাদ্দ হয়েছে সাড়ে সাত কোটি টাকা। এছাড়া প্রতি বছর যোজনা বহির্ভূত ব্যয় ধরা হয়েছে দুই কোটি টাকা। অর্থাৎ দুটি বরাদ্দ হিসাব করলে ভারতে প্রতি বছর মাথা পিছু খেলাধূলার জন্য ব্যয় হয় চার পয়সারও কম। এই ব্যয় পৃথিবীর যেকোনও দেশের তুলনায় অনেক কম। —আনন্দবাজার পত্রিকা

নিখিল ভারত ক্রীড়া পরিষদের সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুসারে।

ধাঁধা

১। প্রথম উবের কাপ প্রতিযোগিতায় ফাইনালিস্ট দুটি দেশের নাম কি কি?

২। প্রথম বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতা হয়—১৯২৬/'৩০/'৩৪ সালে?

৩। হ্যাণ্ডবল ওলিম্পিক্সের আসরে প্রথম কবে খেলা হয়?

৪। ভারতীয় হকি ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—দিল্লি/গোয়ালিয়র/জলন্ধর-এ?

৫। টেবল টেনিস খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রথম কে 'অর্জুন' পুরস্কার পান?

৬। উনিশতম ওলিম্পিক গেমস অনুষ্ঠিত হয়—মেক্সিকো/মিউনিখে/মন্ট্রিয়ল-এ?

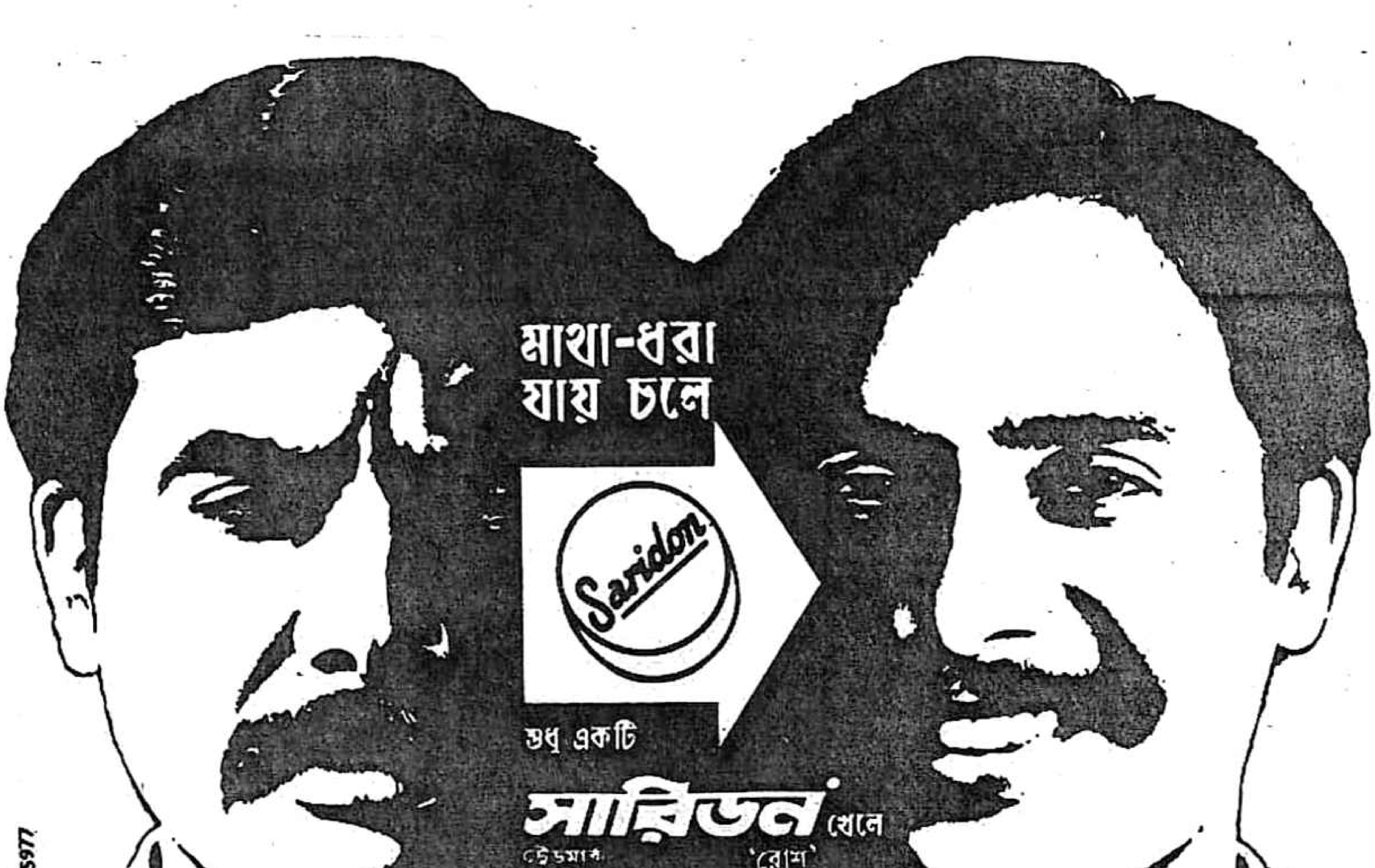
৭। প্রথম কোন্ বোলার রঞ্জি ট্রফির ম্যাচে এক ইনিংসে দশটি উইকেটই পান?

৮। ওলিম্পিক্সে প্রথমবার ব্যক্তিগত রোড সাইকেল রেসের প্রতিযোগীদের কতটা পথ অতিক্রম করতে হয়েছিল—৬৫ কি মি/৪৭ কি মি/১০০ কি মি?

সঙ্কলক হোসি মিস্ত্রি

(উত্তর ২৯ পাতায়)





সোভিয়েট জিমন্যাস্টরা কলকাতা মাতিয়ে গেলেন

স্টাফ রিপোর্টার

জিমন্যাস্টিক্স বিশ্বের এক নম্বর দল সোভিয়েটের ছেলেমেয়েরা শারীরিক সক্ষমতার কোন স্তরে পৌঁছেছে তার কিছুটা নিদর্শন কলকাতার হাজার দশেক দর্শক চাক্ষুষ করলেন নেতাজী ইণ্ডোর স্টেডিয়ামে। চারজন রুশ তরুণীর প্রদর্শিত আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিক্সের কিছু মনোরম কলাকৌশল নতুন হলেও কলকাতাবাসীদের মুগ্ধ করেছে। অলিম্পিক্স জিমন্যাস্টিক্সের সঙ্গে এই আর্টিস্টিক জিমন্যাটিক্সের কোনও মিল নেই। পিয়ানোর শ্রুতিমধুর গৎ-এর সঙ্গে তাল রেখে এই চার রুশ তরুণীর ছন্দোময় কসরতগুলি সকলকেই আনন্দ দিয়েছে। কখনো এককভাবে, কখনো বা দু'জন মিলে বল, রিং, রিবন ও খালি হাতে রুশ মেয়েরা নানারকম ফিগার দেখিয়েছেন।

চার সদস্যের সমন্বয়ে গড়া রুশ দলটির বয়সের গড় ১৭ বছর। সবচেয়ে কমবয়সী সদস্যার নাম টি ই আগারোক। মাত্র ১৮ বছর বয়সেই মাস্টার অফ স্পোর্টস ডিগ্রি পেয়েছেন। মিনস্ক শহরের স্পেশাল স্পোর্টস স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী আগারোক বর্তমানে আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিক্সে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন। জাতীয় রানার্স এস কে সেলিংস্কয়া একই স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্রী। মাস্টার অফ স্পোর্টস ডিগ্রিধারী। বয়স ১৫। উপরোক্ত দু'জনের একজনও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের জিমন্যাস্ট নন।

বাকি দুই সদস্যা ওলগা রবিনোভিচ ও এস এন কারপেটচেঙ্কো দু'জনেই আন্তর্জাতিক মানের জিমন্যাস্ট। এরমধ্যে ২০ বছর বয়সী ওলগা বর্তমানে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। ১৩ বছর বয়সে মাস্টার অফ স্পোর্টস ডিগ্রি পেয়েছিলেন। ওলগা মিনস্ক ইনস্টিটিউট অফ ফিজিক্যাল কালচারের চতুর্থ বর্ষের ছাত্রী। কারপেটচেঙ্কোর বয়স ১৯ বছর। মাস্টার অফ স্পোর্টস ডিগ্রিধারী কারপেটচেঙ্কো মিনস্কের ইনস্টিটিউট অফ ফিজিক্যাল কালচারের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী।

আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিক্সের সঙ্গে জিমন্যাস্টিক্সের তফাৎটা দর্শকদের বুঝিয়ে দেবার ব্যবস্থাও রেখেছিল উদ্যোক্তা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য জিমন্যাস্টিক্স সংস্থা। রুশ দলের প্রতিটি কম্পোজিশনের ফাঁকে ফাঁকে বাংলার মেয়ে ও ছেলেরা ফ্লোর, বিম এবং আন-ইভন বারে নানারকম ফিগার করে দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছেন, বিশেষ করে সাত বছর বয়সী শম্পা মজুমদার বিমের ওপর কিছু কঠিন ফিগার দেখিয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দেন। শম্পার বিম ব্যালান্স রুশ দলের সদস্যাদেরও মুগ্ধ করেছে। বিভিন্ন ইভেন্টে বাংলার যে মেয়েরা ছিলেন : অপর্ণা পাল, চৈতালী খান, শম্পা মজুমদার, শর্মিষ্ঠা ভট্টাচার্য, মিতালী স্বর্ণকার, নমিতা রায়-চৌধুরী, রীণা প্রামাণিক, কবিতা কোলে, রিতা মজুমদার। এছাড়া বাংলার ছেলেরা ফ্লোরে নানারকম এক্সারসাইজ দেখিয়েছেন। একটি জমাটি রুশ গানের সঙ্গে আগন্তুক দলের চার সদস্যার সমবেত নাচের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের চেয়ারম্যান স্নেহাংশুকান্ত আচার্য।

ছবি : সত্য সেন



বল হাতে মনোরম ভঙ্গীতে ওলগা রবিনোভিচ

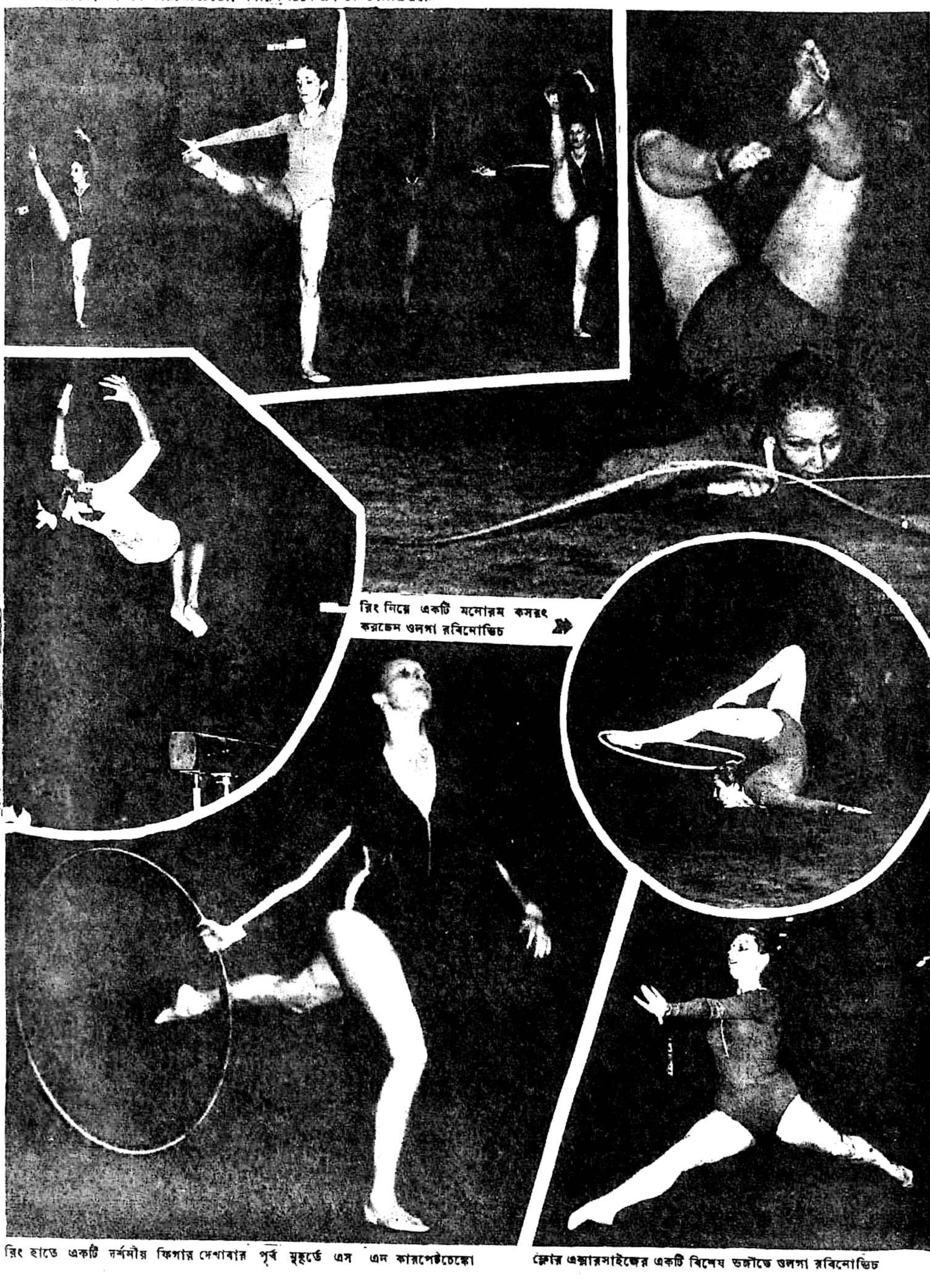


সাত বছরের শম্পা মজুমদার বিম ব্যালান্সে



চার রুশ তরুণী (বাঁদিক থেকে) এস কে সেলিভস্কয়া, টি ই আগারোক, ওলগা রবিমোভিচ ও এস এম কারপেটচেঙ্কো

আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিক্সের একটি ফিগার দেখাচ্ছেন চার রুশ তরুণী (বাঁদিক থেকে) ওলগা রবিনোভিচ. টি ই আগারোক, এস এম কারপেটচেঙ্কো, সবার পিছনে এস কে সেলিভস্কয়া.



হাতে দড়ি নিয়ে একটি কঠিন ফিগার করার সময় ওলগা রবিনোভিচ

বিমের উপর ব্যাক সামার জল্ট দিচ্ছেন ইৎভোনী খাম

রিং নিয়ে একটি মনোরম কসরৎ করছেন ওলগা রবিনোভিচ

রিং হাতে একটি দর্শনীয় ফিগার দেখাবার পূর্ব মুহূর্তে এস এম কারপেটচেঙ্কো

ফ্লোর এক্সারসাইজের একটি বিশেষ ভঙ্গীতে ওলগা রবিনোভিচ

দ্বিজুদার চোখে

দিগদর্শক

দ্বিজুদার কাছে আজকাল আর যাওয়া যায় না। ক্রমশ গম্ভীর হয়ে পড়ছেন—কি সব বিড়বিড় করে বলছেন, ভাল বোঝাও যায় না। বললেন গুলুবাবু। আমি বললাম, সেকি? আমি তো এই পুজোর সপ্তাহ দুয়েক আগেই দেখলাম তিনি দিব্যি বহাল তবিয়তে রয়েছেন।

—বহাল তবিয়তে রয়েছেন? গুলুবাবু আমাকে বললেন। তুমি ঠিক বলছ? আমি বললাম, আমার বাজে কথা বলার দরকার কি? আমি স্পষ্ট দেখেছি দ্বিজুদা বহাল তবিয়তে রয়েছেন।

গুলুবাবু বললেন, আমি তো দশদিনের আগেকার খবর জানি—তিনি বহাল তবিয়তে নেই। তাছাড়া, তাছাড়া তার একটা শক্ত গোছের ব্যামো হয়েছে।

—শক্ত গোছের ব্যামো হয়েছে? এবার আমার জিজ্ঞাসার পালা,—আপনি ঠিক বলছেন?

—হ্যাঁ শক্ত কোন ব্যামো। মানে তার হৃদপিণ্ড বোধহয় আর ভাল মতো চলছে না।

—সে আবার কি?

—হ্যাঁ দ্বিজুদা তো তাই বললেন। গুলুবাবু বললেন। ডাক্তার বলেছে—মানে যা বলেছে তাতে জবাব দিয়ে দিয়েছেই বলা যায়।

—কোন্ ডাক্তার? আমি প্রশ্ন করলাম।

—বাঞ্ছারাম ডাক্তার, আবার কোন্ ডাক্তার। গুলুবাবু বললেন, উনি কি কলকাতার অন্য ডাক্তার চেনেন নাকি? দ্বিজুদার মাসতুত দাদা দাবুকে তো চেন? দাবুর একটা রেশন দোকান আছে ভবানীপুরে। তা রেশনের দোকান তো সন্ধেবেলা খোলা থাকে না, সেখানে এই বাঞ্ছারাম ডাক্তারকে বসিয়েছেন ওরা। ফলে উনি দ্বিজুদাদের বাড়িসুদ্ধ লোককে বিনামূল্যে চিকিৎসা করেন।

আমি বললাম, আমি জানি। বিনামূল্যে চিকিৎসা করেন,তা বলে উনি খারাপ ডাক্তার নন। চলুন না একবার ডাক্তারের কাছে ঘুরেই আসি। মোটামুটি নাম হয়েছে তার। সব সময়েই কিছু না কিছু রোগী থাকে।

গুলুবাবু বললেন, তবে অসুখ খুবই ঘোরালো সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। দ্বিজুদা আমার গাড়িটা নিজের গ্যারাজে দিন-রাতের জন্য রেখে দিয়েছেন। আজকাল যা ট্যাক্সির অবস্থা—সেজন্য দরকার হলেই যাতে হাসপাতালে যেতে পারেন সেজন্য এটা করেছেন।

আমি একটু অবাকই হলাম। তাই তো দ্বিজুদার শরীর এতখানি খারাপ হয়েছে জানতাম না। তার চেহারা চিরকালই রোগা। দেখলে মনে হয় যেন কতদিন খান না, কিন্তু তার কব্জীর জোর দেখলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। একবার দেখেছিলাম পার্কের রেলিং-এর শিক অবলীলাক্রমে যোলবার বাঁকিয়ে ভেঙেই ফেললেন। তার একটা লাঠির দরকার হয়েছিল! তার হৃদপিণ্ডও বরাবরই ভাল। দু'চার মাইল অনায়াসে দ্রুত হাঁটতে পারেন। এসব কথা আমি গুলুদাকে বললাম। গুলুদা বললেন, কথাটা ঠিক—কিন্তু মানুষের শরীর, কার কখন কি হয় কেউ বলতে পারে? তাছাড়া আপাতদৃষ্টিতে হয়ত মনে হয় শরীর খুব ভাল আছে, কিন্তু আসলে হয়ত ভেতরে ভেতরে···।

কথা বলতে বলতে আমরা ভবানীপুরে



এসে পড়লাম। দেখি বাঞ্ছারাম ডাক্তারের চেম্বারে জনা পাঁচেক অপেক্ষা করছেন। ডাক্তার নিশ্চয় ভেতরে আছেন। আমরা একটা স্লিপ লিখে বেয়ারার কাছে দিলাম, বেয়ারা সেটা দিয়ে এল চালের বস্তা দিয়ে আড়াল করা ডাক্তারের কাছে। তারপর যথাসময়ে আমাদের ডাক এল। আমরা গেলাম। কয়েকবার দ্বিজুদার সঙ্গে এসেছি এখানে। ডাক্তার আমাদের দেখে চিনতে পারলেন। বললেন, কি ব্যাপার?

আমি বললাম, দ্বিজুদা কেমন আছেন?

ডাক্তার বললেন, জানি না তো!

গুলুবাবু বললেন, জানি না মানে? বলেই বুঝলেন ভাষাটা ভদ্র মত হয়নি। তিনি বললেন, মানে আপনি জানেন না ওর দারুণ অসুখ করেছে?

—উঁহু! ডাক্তার বললেন। গত দু' মাস ওর সঙ্গে আমার তো দেখাই হয়নি। আর গাড়ি চাপা পড়া বা ছাত থেকে পড়া ছাড়া ওর গুরুতর কিছু হবে না। ওর যা স্বাস্থ্য দুর্ঘটনা না হলে ও একশ বছর পর্যন্ত বেচে যাবে।

গুলুবাবু বললেন, না মানে—শুনলাম ওর নাকি হৃদপিণ্ডের অবস্থা খুব খারাপ। মানে, এখন-তখন ব্যাপার?

ডাক্তার হা-হা করে হাসলেন। বললেন, একদম বাজে কথা। ও আমার কাছে আসেইনি।

আমরা বেরিয়ে আসার পর গুলুবাবু বললেন, এক একজন ডাক্তারের আত্মপ্রত্যয় দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। দ্বিজুদা নিজে বলেছেন তার অসুখ এবং দারুণ অসুখ, অথচ এই ডাক্তার বলছেন—না, এসব বাজে কথা। আসলে শক্ত অসুখ বলে ওকে দেখাননি দ্বিজুদা। কেন দেখাবেন, হয়েছে তো হৃদপিণ্ডের অসুখ, তাই নিশ্চয় গেছেন বিশেষজ্ঞদের কাছে। ইনি তো চার টাকার ডাক্তার—ইনি হৃদপিণ্ডের কি বোঝেন?

—তাই হবে। আমি বললাম।

—তাই হবে বলছ কেন? গুলুবাবু বললেন। এ নিশ্চিত আমি বলে দিলাম। চল ওর বাড়ি—কাছেই তো। ওখানেই দেখে আসি না কি ব্যাপার?

আমরা দ্বিজুদার বাড়িতে গিয়ে শুনলাম দ্বিজুদা নেই। দ্বিজুদার এক ভাইপো সাবু আর কে যেন দাওয়ায় বসে দাবা খেলছিল। আমাদের দেখে উঠে এসে বলল, তিনি তো নেই।

—নেই মানে? গুলুবাবু চমকে গেলেন। ভাবলেন, গুলুদা বোধহয় সেদিনই সকালে মারা-টারা গেছেন। কিংবা নিদেনপক্ষে হাসপাতালে।

সাবু বলল, নেই মানে নেই। জানেন না বুঝি—উনি তো সপ্তাহ তিনেক আগে বোম্বাই চলে গেছেন।

—বোম্বাই? যশলোক হাসপাতালে বুঝি?

—আজ্ঞে না। হিমালয়ান মোটর র‍্যালিতে।

এবারে গুলুবাবু একেবারে কাত। কাত আমিও। আমি বলি, হিমালয়ান মোটর র‍্যালি দেখতে অতদূরে চলে গেলেন, ওই শরীর নিয়ে?

সাবু বলল, দেখতে না, যোগ দিতে। একখানা গাড়িও যোগাড় করেছেন দেখলাম। তিনদিন তো দারুণ রকম প্র্যাকটিস করলেন—তারপর সোজা বোম্বাই চলে গেছেন। কালই তো র‍্যালি শুরু। কাকা বলেছেন তিনি জিতবেনই।

এবার গুলুবাবু বুকে হাত দিয়ে বসে পড়লেন। বললেন, উঃ আমার গাড়িটা বাগানোর জন্য এইসব মিথ্যে বলেছে। উঃ আমার বুক ধড়ফড় করছে। যদি গাড়ির কিছু হয়? নিয়ে চল—নিয়ে চল ডাক্তারের কাছে। এই রিকসা—রিকসা!!

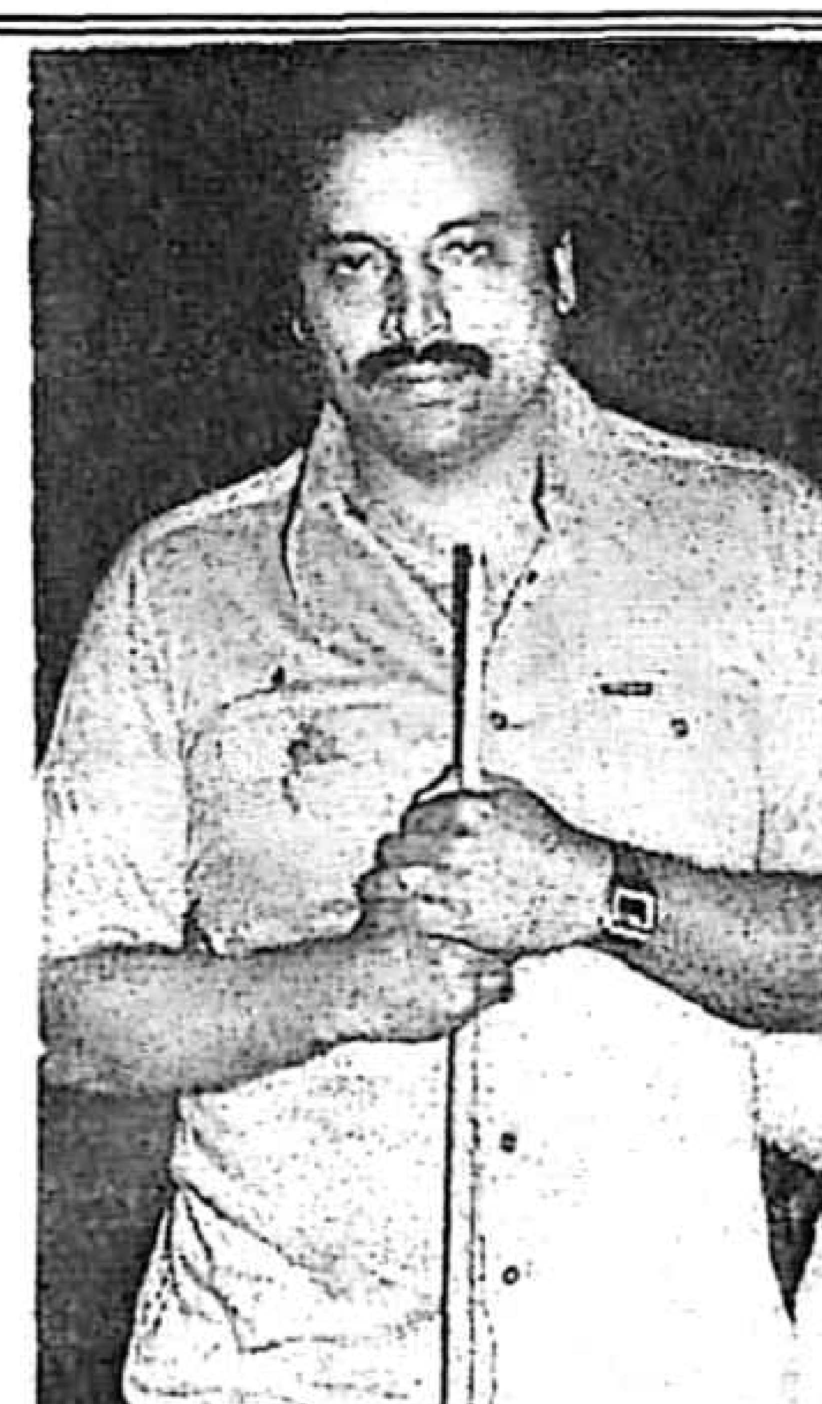
একটা রিকসা এসে থামল। আমরা দুজনে তার উপর উঠে চড়লাম। গুলুবাবুকে দেখলাম তিনি বেশ কাতর হয়ে পড়েছেন।●

কলকাতায় বিলিয়ার্ডস প্রতিযোগিতায় তারকারা আসছেন

স্টাফ রিপোর্টার

আগামী ৯ই নভেম্বর থেকে ২৫ নভেম্বর কলকাতার ডালহাউসি ইনস্টিটিউটে ৪৭ তম জাতীয় বিলিয়ার্ডস ও স্নুকারের যে প্রতিযোগিতা হবে সেখানে প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন মাইকেল ফেরিরা খেলছেন। মাইকেল ফেরিরা এখন বিলিয়ার্ডসে ভারতের এক নম্বর খেলোয়াড় এবং জাতীয় চ্যাম্পিয়ন। ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম সারির খেলোয়াড়দের মধ্যে অরবিন্দ সাভুর, জি পারেখ, সৈয়দ হাবিব, এস বি আগরওয়াল, টনি মণ্টেরিও, আর পি রাও, এম জয়রাজ, গীত শেঠিয়া এবং পশ্চিম বাংলার মনোজ কোঠারী, এ কে গোদ্দার, এম ফ্রান্সিস, পি ভগত ও এস আহমেদ জাতীয় বিলিয়ার্ডস ও স্নুকার প্রতিযোগিতায় যোগদান করবেন।

এছাড়া ইংল্যাণ্ডের এক নম্বর খেলোয়াড় জো ও বয় ওয়েলসের স্টিফেন নিউবারি ও মাস্টার জো গ্রেস আসছেন। জাতীয় জুনিয়র বিলিয়ার্ডস ও স্নুকার প্রতিযোগিতাও একই সঙ্গে এবার কলকাতার রবীন্দ্র



মাইকেল ফেরেরা

সরোবরের কাছে বেঙ্গল রোয়িং ক্লাবের বোর্ডে হবে। বিলিয়ার্ডস ও স্নুকার ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ার যুগ্ম সম্পাদক পি এন রায় ১০ অক্টোবর সাংবাদিকদের জানান, জাতীয় সিনিয়র ও জুনিয়র বিলিয়ার্ডস ও স্নুকার প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগীর সংখ্যা যথাক্রমে ৫৬ ও ৪৬ জন। প্রতিযোগীদের কলকাতায় থাকা, খাওয়া ও যাতায়াতের সব ব্যবস্থা উদ্যোক্তারা গ্রহণ করেছেন। গত বছরের জাতীয় সিনিয়র ও জুনিয়র প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালিস্টদের বাছাই খেলোয়াড়রা নির্বাচিত হবেন। প্রতিযোগিতা সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নক আউট ভিত্তিতে পরিচালিত হবে।

মাইকেল ফেরিরা ও অরবিন্দ সাভুর বিলিয়ার্ডসে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স। স্নুকার অরবিন্দ সাভুর ও জি পারেখ। জুনিয়র বিলিয়ার্ডসে জি শেঠি ও আর কে ভকিল এবং স্নুকারে ডি ম্যাকেঞ্জি ও পি শাহ চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স হন।

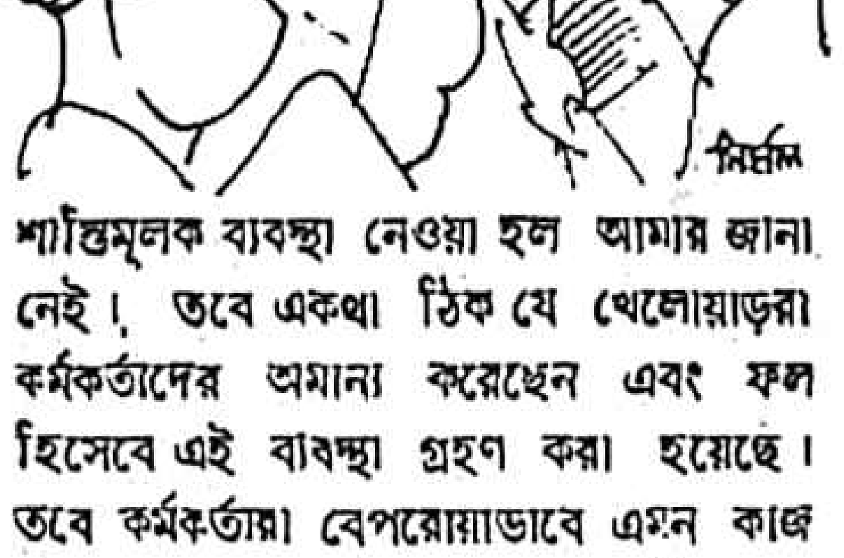
কিছু মনে করবেন না

খেলোয়াড়দের মান ও কর্মকর্তা

নারি পরাশর

এই সেদিন একটি ক্রীড়া সংস্থার জনৈক কর্মকর্তা দেখা হতেই বললেন, ওহে, খুব তো খেলাধুলোর প্রশাসনের গলদ নিয়ে লিখছ। কর্মকর্তারা খেলোয়াড় অথবা অ্যাথলিটদের প্রয়োজনের দিকে নজর দেয় না ইত্যাদি আরও কত কিছু! কই খেলোয়াড়দের মান যে অত্যন্ত নেমে যাচ্ছে তার উপর তো লিখছ না। ভদ্রলোকের বক্তব্য হল, কার্যত খেলোয়াড়রা—সে ছেলেমেয়ে সবাই—নিজেদের মান উন্নয়নের জন্য কোন চেষ্টা করে না। আসলে ওই কর্মকর্তা সম্প্রতি হায়দ্রাবাদে মঈন-উদ্দৌলা গোল্ড কাপে একটি পুরো দল শৃঙ্খলার খাতিরে বাতিল করার ঘটনাটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেও আসলে আমাদের এই বাংলার খেলোয়াড়দের দিকেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছিলেন সেটা আমার জানা ছিল। এখানে পাঠকের স্মরণ থাকতে পারে যে, উদ্যোক্তা হায়দ্রাবাদ তার নির্বাচিত ক্রিকেট টিমকে পুরো বাতিল করে সম্পূর্ণ নতুন একটি দলকে খেলিয়ে ম্যাচ হারে।

অবশ্য আমি ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে এ ব্যাপারে প্রায় সম্পূর্ণ একমত—অবশ্যই শতকরা একশো ভাগ নয়। আপনারা নিশ্চয়ই প্রশ্ন করতে পারেন, কেন নয়? কারণগুলি বলার চেষ্টা করছি। আপনারা সবাই স্বীকার করবেন যে একহাতে তালি বাজে না। আর কেউ কোন কাজে নামার আগে নিশ্চয়ই তার পরিণতির কথা চিন্তা করে নেবেন। হায়দ্রাবাদে এমন কি ঘটনা ঘটল যাতে করে তাড়াহুড়ো করে এত কড়া



শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হল আমার জানা নেই। তবে একথা ঠিক যে খেলোয়াড়রা কর্মকর্তাদের অমান্য করেছেন এবং ফল হিসেবে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তবে কর্মকর্তারা বেপরোয়াভাবে এমন কাজ হরবকত করে থাকেন। এমনকি দল নির্বাচনে পর্যন্ত! যদি ঘটনাক্রমে তাদেরই নির্বাচিত একটি দল পরে তাদের অপছন্দ হয় এবং বাতিল করার প্রয়োজন পড়ে তবে এখন হায়দ্রাবাদের ঘটনা তো তাদের সামনে দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়ানোর আর কোন অসুবিধা রইল না। এমনকি এই দৃষ্টান্ত তাদের এধরনের কাজ করার প্রবণতা বাড়াতেও পারে। সুতরাং মান উন্নত করতে না পারার জন্য খেলোয়াড়দের শুধু দোষ দেওয়া উচিত নয়। তাদেরও ক্ষোভ থাকতে পারে।

এই ক্ষোভগুলির মধ্যে প্রধান সুযোগ-সুবিধা ও খেলার অনুকূল পরিবেশের অভাব। এর ফলেও তাদের মান উন্নত হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। অবশ্য আমি একথা বলতে চাই না যে খেলোয়াড়রা কর্মকর্তাদের চেয়ে সবসময় উচ্চ স্থান পাক। এটা কোন সমাধান হতে পারে না। আমার প্রশ্ন, খেলোয়াড়রা যে কঠোর ট্রেনিং রুটিন ইত্যাদি মেনে চলেন কর্মকর্তারা মধ্যাহ্ন ভোজনের বিরতিসহ তাদের খাদ্য ও অন্যান্য সব সুযোগ সুবিধা মেনে নিয়ে তাদের সঙ্গে চলতে পারেন? আমার সন্দেহ আছে। কেন কর্মকর্তারা মাঝে মধ্যে এমন করেন না যাতে করে কী কী অসুবিধা খেলোয়াড়দের হচ্ছে তা জীবন দিয়ে তারা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। তাদের উভয়ের মধ্যে ফারাক ও বোঝা সম্ভব হয়। আর সম্ভব হয় খেলোয়াড়দের অসুবিধাগুলি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান আহরণ করা।

আরও একটি সমস্যার দিকে কর্মকর্তাদের নজর দেওয়া প্রয়োজন। সেটি হল: আমাদের দেশে খেলোয়াড়দের জন্য গড়ে তোলা পরিবেশ ও অন্যান্য দেশের পরিবেশ এবং দুই-এর মধ্যে তুলনা। একথা নিশ্চিতভাবে বলা চলে। তাহলে অনেক নতুন আইডিয়া, পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা জ্ঞান আহরণ করতে পারবো এবং তা আমাদের ট্রেনিং সূচীতে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবো।

এখন আবার সেই কর্মকর্তার প্রসঙ্গে আসা যাক। উনি সেদিন আমাকে বাংলার ক্রিকেটারদের গত এক মাসে তিনটি ম্যাচের সব ক'টি ম্যাচে হারার দিকেই চোখে আঙুল দিয়ে বোঝাতে চাইছিলেন। সমস্ত ক'টি ম্যাচেই আমাদের ক্রিকেটাররা যে ব্যাটে বলে চরম ব্যর্থতা দেখিয়েছেন একথা অনস্বীকার্য। তিনি বছরের গোড়াতে গৌহাটিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পূর্বাঞ্চলের ব্যর্থতার কথাও উল্লেখ করলেন। কারণ ওতে বাংলার খেলোয়াড়ই বেশি ছিল। তিনি বললেন, অবশ্যই পাকিস্তানীরা অনেক শক্তিশালী। কিন্তু তিন দিনের ম্যাচ দু'দিনে শেষ হবে? কোন প্রতিরোধও আমরা গড়ে তুলতে পারব না?

প্রশ্নগুলির পিছনে যুক্তি আছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার বন্ধু একথা উল্লেখ করলেন না যে, পূর্বাঞ্চলের রাজ্য ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনগুলি (যার মধ্যে সি এ বি একটি উল্লেখযোগ্য অ্যাসোসিয়েশন) খেলোয়াড় তৈরির জন্য কতটুকু কাজ করেছে বা করছে? আপনিও বলবেন, শূন্য।

তাহলে ব্যর্থতার জন্য কি কেবল খেলোয়াড়দের দোষারোপ করা ঠিক কাজ? কর্মকর্তাও অ্যাসোসিয়েশনের সাত খুন মাপ! আগেই বলেছি, হাততালি দিতে দু'টি হাতের প্রয়োজন পড়ে। একটিতে বাজে না। এটাই আমাদের দেশের প্রত্যেক খেলার মধ্যে আসল গলদ। কোন ক্রীড়া সংস্থা যতই অর্থবান হোক না কেন, তার প্রশাসন যত সক্ষমই হোক না কেন সর্বত্রই কর্তৃপক্ষ ও খেলোয়াড় একে অপরের পরিপূরক হিসাবে কাজ করতে অভ্যস্ত নয়।



万宝路广州网球精英大赛

Marlboro Canton Grand Prix Tennis Classic

চীনের প্রথম গ্রাঁ প্রি টেনিসে

সুব্রত সরকার ক্যাণ্টন থেকে ফিরে

মার্লবরো ক্যাণ্টনের গ্রাঁ প্রি টেনিস ক্লাসিক খেলা হয় মূলত স্টেডিয়ামের একটি মাত্র কোর্টে। তাই খেলা আরম্ভ হত সকাল ৯টা থেকে, চলত বিকেল অবধি। সন্ধ্যাবেলা ফ্লাডলাইটে খেলা সাতটায় শুরু করা হত, মাঝে মাঝে বেশ রাত অবধি হত।

স্টেডিয়ামের বাইরে আরও দু'টি কোর্ট। এগুলিতে ডাবলসের প্রথম রাউণ্ডের খেলা হয়, অন্য সময় প্লেয়াররা প্র্যাকটিস করেন। স্টেডিয়ামের আসন সংখ্যা ৫,৭৬০। তবে একমাত্র ফাইনালের দিন হাজার পাঁচেক দর্শক হয়েছিল। তার আগে সন্ধ্যাবেলায় হাজার আড়াই দর্শক হত।

চীনের দর্শকরা টেনিস খেলা থেকে এখনও রস গ্রহণ করতে পারছেন না। কখন হাততালি দিতে হবে, কখন খেলার গুরুতর অবস্থা, অধিকাংশ দর্শকই ধাঁধায় পড়ে যেতেন। এর ফলে শেষ দিনের আগে আসর তেমন জমেনি।

টেলিভিসনে খেলা দেখান হচ্ছিল প্রধানত এই কারণেই স্টেডিয়ামের চার ধারে জাপানী কোম্পানী টয়োটার বিজ্ঞাপন। টয়োটা অনেক ক্ষেত্রেই চীনের বাণিজ্যে প্রবেশ করেছে।

১৩ অক্টোবর সন্ধ্যাবেলায় ক্যাণ্টন ক্লাসিকের 'হেডকোয়ার্টার্স' বাইয়ুন হোটেলে পৌঁছে শুনি সন্ধ্যা সাতটায় রমেশ কৃষ্ণণের প্রথম খেলা। তাড়াতাড়ি চলে গেলাম স্টেডিয়ামে। রমেশ অবশ্য সেদিন জিততে পারলেন না। তার ফোরহ্যাণ্ড মোটেই কার্যকরী হয়নি। খেলায় অস্ট্রেলিয়ার ব্র্যাড ড্রিউয়েট আরও বেশি দৃঢ়তা দেখান।

রমেশ ছিলেন পঞ্চম বাছাই, তবে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলায় ড্রিউয়েট দেড় ঘণ্টার পর ৭-৬, ৬-৪-এ জেতেন। কোয়ার্টার ফাইনালে তিনি চিলির অভিজ্ঞ প্লেয়ার হাইমে ফিয়োলকে হারাবার পর সেমিফাইনালে টেণ্টস্কারের কাছে পরাজিত হন।

ডাবলসেও রমেশ প্রথম রাউণ্ডে হারেন। তার পার্টনার ছিলেন হারুণ ইসমাইল। ইসমাইলের বাবা আমেদাবাদ (গুজরাট) থেকে রোডেশিয়ায় গিয়ে বসবাস আরম্ভ করেন। ইসমাইল এখন স্বাধীন জিম্বাবওয়ের (রোডেশিয়া) নাগরিক। সামান্য গুজরাটি ভাষা জানেন—রেগে গেলে লাইন্সম্যানদের গালাগালি করতে মাতৃ ভাষা ব্যবহার করেন!

ক্যাণ্টন ক্লাসিক আরম্ভ হওয়ার দু'দিন আগেই রমেশ প্লেনে করে হংকং থেকে গুয়াংজোতে হাজির হয়েছিলেন। সার্কিটে তার সাফল্য বেশ—এ টি পি তালিকায় ৬৬ নম্বর। চীনে রমেশ সুবিধা করতে পারলেন না। তবে মনে রাখা উচিত ন্যাটা ড্রিউয়েটও আরেকজন ভবিষ্যতের তারকা।

শশী মেনন গুয়াংজোতে মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) সন্ধ্যায় এসে হাজির হন। এসেছেন হোভারক্রাফটে করে মাকাউ থেকে। হোটেলের লিফটে আমাকে দেখে খুব অবাক।

পরের দিন দুপুর রোদে শশী তিন সেটের খেলায় অস্ট্রেলিয়ার রস কেসকে হারান ৬-৩, ৪-৬, ৬-১-এ। দু'জনের শেষ সাক্ষাৎ বছর দেড়েক আগে মাদ্রাজে ডেভিস কাপের খেলায়। সেবার কেস জিতে ছিলেন। তবে শশী তৃতীয় সেটে সার্ভ ভাল করেন আর চমৎকার খেলতে লাগেন।





কোর্ট থেকে বেরিয়ে আসার সময় আমায় বললেন, তোমার ক্যামেরায় ছবি উঠবে তো? তাহলে আমার একটা ছবি নাও এই 'মার্লবারো' সাইনের ধারে—ক্যাপসন হবে, চীনে টেনিস ম্যাচ জয়ী প্রথম ভারতীয়।

শশী দ্বিতীয় রাউণ্ডে টেণ্টস্কারের কাছে হারেন, ৫-৭, ২-৬-এ। কিন্তু সময় সময় দারুণ কতগুলি উইনার মারেন। তবে শশীর ধৈর্যের অভাব চিরকালই, যখন র‍্যালি বেশিক্ষণ চলতে থাকে, চঞ্চল হয়ে গিয়ে ভুল করেন। আরেকটু ধৈর্য ধরে খেললে শশী টেণ্টস্কারকে মুস্কিলে ফেলতে পারতেন বলে আমার মনে হয়েছে।

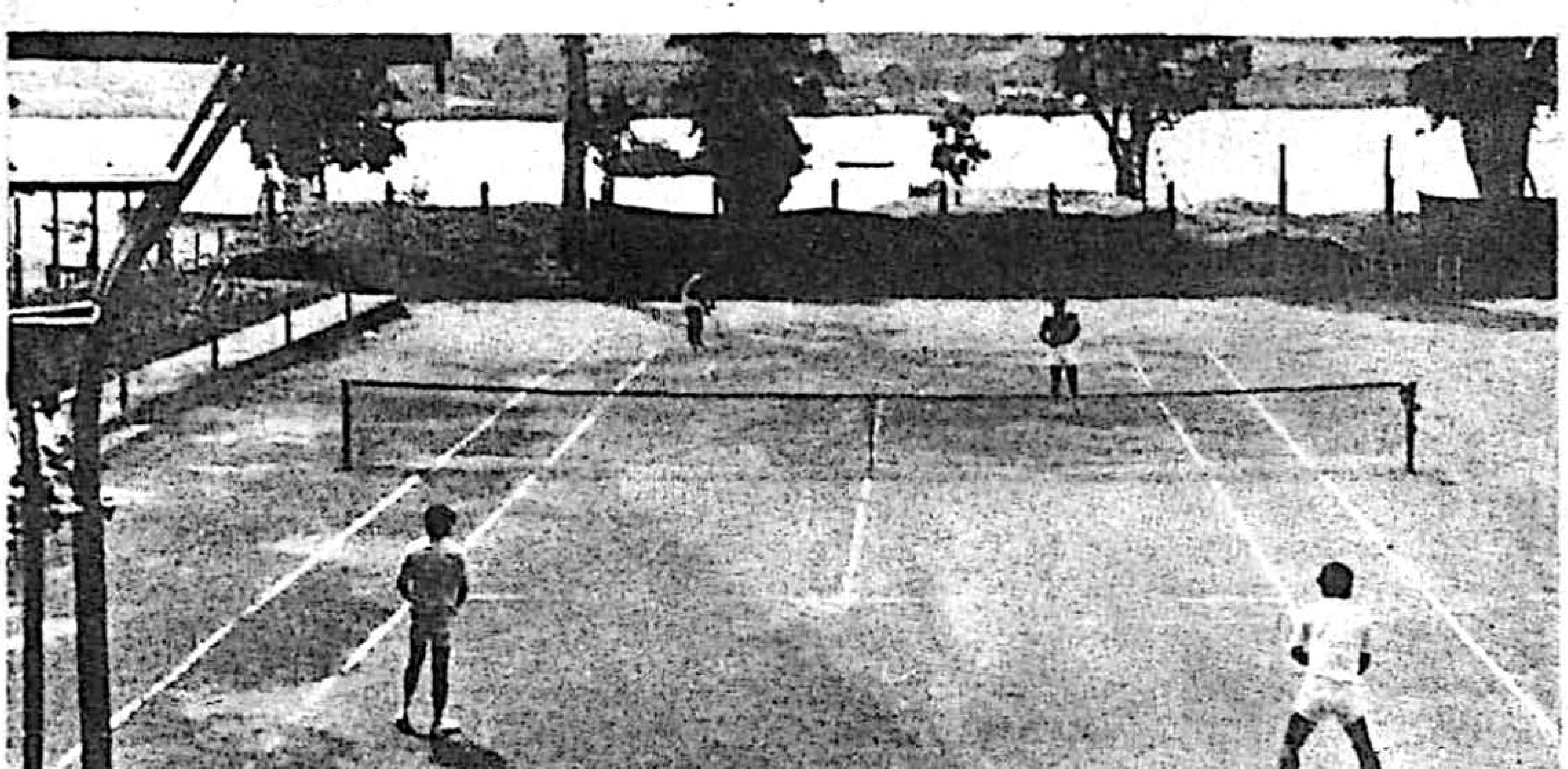
ডাবলসেও শশী ক্লিফ লেচারের সঙ্গে পার্টনারশিপে প্রথম রাউণ্ডে জেতেন। তাই ক্যাণ্টন ক্লাসিক থেকে রমেশের আয় ৪৮৭ মার্কিন ডলার (প্রায় ৩,৯০০ টাকা) আর শশীর আয় ৯২৫ ডলার (প্রায় ৭,৪০০ টাকা)। শশী আমায় জানালেন, ক্যাণ্টন ক্লাসিকই সম্ভবত এবছরের বিশ্বব্যাপী ভলভো গ্রাঁ প্রি সার্কিটের একমাত্র টুর্নামেণ্ট যেখানে প্লেয়ারদের প্রাইজমানি থেকে আয়কর বাদ দেওয়া হয় না।

সিঙ্গলস ফাইনাল খেলা হিসাবে জমেনি, তবে ডাবলস ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরও ভাল হয়। শেষ অবধি রস কেস-হাইমে ফিয়োল জুটি আমেরিকার তরুণ ল্যারি স্টেফান্কি আর অ্যাণ্ডি কোহনবার্গকে হারান, ৬-২, ৭-৬। দ্বিতীয় সেটে টাইব্রেকারে কেস-ফিয়োল ১১-৯ পয়েণ্টে জেতেন। তবে মার্কিন জুটি এক সময়ে ৫-০ পয়েণ্টে এগিয়ে ছিল—আরেকটু অভিজ্ঞ হলে তারা নিশ্চয় টাইব্রেকার জিতে খেলাটি তৃতীয় সেটে নিয়ে যেতে পারতেন।

সিঙ্গলস প্রতিযোগিতায় রমেশ ছাড়া বাছাই প্লেয়ারদের মধ্যে আরও তিনজন প্রথম রাউণ্ডেই পরাজিত হন। সেমিফাইনালে একমাত্র অবাছাই প্লেয়ার ছিলেন ড্রিউয়েট। ১৯৭৯ উইম্বলডনে অস্ট্রেলিয়ার এই তরুণ বাছাই খেলোয়াড় ভিক্টর পেচ্চিকে হারিয়েছিলেন, তাই রমেশের তার কাছে হারাটা একেবারে অপ্রত্যাশিত বলা যায় না।

ইণ্টারন্যাশনাল ম্যানেজমেণ্ট গ্রুপের হংকং শাখা মার্লবারোর হয়ে এই প্রতিযোগিতার পরিচালনার ব্যবস্থা করে। ক্যাটন সাহেব ছিলেন টুর্নামেণ্ট ডিরেক্টর, রেফারি হিসাবে আই এম জি নিয়ে আসে অস্ট্রেলিয়ার এক সময়ের বিশ্বখ্যাত ডাবলস প্লেয়ার বব হাউকে। তবে তাদের সব থেকে বড় সাফল্য জিমি কনর্সকে গুয়াংজোতে হাজির করা।

কনর্স না খেললে মার্লবরো ক্যাণ্টন গ্রাঁ প্রি টেনিস ক্লাসিক অনেক অন্য ছোট (৫০,০০০ ডলার) টুর্নামেণ্টের মতন হত। কনর্সের উপস্থিতি আর ব্যক্তিত্বই চীনের এই প্রথম পেশাদারী প্রতিযোগিতাকে স্মরণীয় করে দেয়।



শামিয়েনে পার্ল নদীর ধারে, ক্যাণ্টন টেনিস ক্লাবের কোর্ট। ছবি : সুব্রত সরকার



স্বদেশে এই প্রথম আন্তর্জাতিক টেনিস প্রতিযোগিতার সিঙ্গলস খেলায় অংশগ্রহণ করেছিলেন চীনের তিনজন প্লেয়ার। দু'জন পরাজিত হন প্রথম রাউণ্ডে। শাংহাই-এর খেলোয়াড় সু মেইলিন গতবছর বর্ণ প্রদর্শনীর সময়ে ডাবলসে অংশ নেন। এখন তার বয়স ২৭। তিনি স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার প্লেয়ার জান নরবাকের কাছে হারেন স্ট্রেট সেটে।

প্রতিযোগিতায় কনিষ্ঠতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন লিউ শুহুয়া। বয়স ১৮। তবে লম্বায় ছ'ফুট দু' ইঞ্চি। তিনিও স্ট্রেট সেটে পরাজিত হন—হারুণ ইসমাইলের বিরুদ্ধে।

চীনের তৃতীয় প্লেয়ার দ্বিতীয় রাউণ্ড অবধি পৌছান। সেখানে তরুণ মার্কিন খেলোয়াড় ম্যাট মিচেলের কাছে হারেন। সাই জাও গতবছর এ টি পি আয়োজিত সফরে আমেরিকায় খেলবার সুযোগ পান। প্রথম রাউণ্ডে তার খেলা পড়ল জার্মানির আন্দ্রেয়াস মরারের বিরুদ্ধে। মরার ১৯৭৯ উইম্বলডনের প্রথম রাউণ্ডে ভারতের আনন্দ অমৃতরাজকে সহজে হারিয়েছিলেন। ক্যাণ্টন ক্লাসিকে মরার-সাই জাও খেলার প্রথম সেট জেতেন মরার, পরেরটি টাই-ব্রেকারে চীনা প্লেয়ার। তৃতীয় সেটের গোড়ার দিকেই মরার অবসর নিতে বাধ্য হন।

সাই জাও-এর বয়স এখন ২১ বছর। তার জন্ম বেইজিং-এ। টেনিস ছাড়া ফুটবলও বেশ খেলেন।

এবারকার টুর্নামেণ্টে চীনের নিজের প্লেয়াররা তেমন সুবিধা করতে পারেননি সত্য, তবে তেমনটি আশাও করা হয়নি। সবেমাত্র চীনা খেলোয়াড়রা আন্তর্জাতিক কম্পিটিশনে খেলছেন—তাও আবার পেশাদারদের সঙ্গে। কিন্তু চীনে গ্রাঁ প্রি টুর্নামেণ্টের ব্যবস্থা করারই এক মূল কারণ—তার ফলে সে দেশে টেনিস সম্পর্কে উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে।

চীনের সর্বপ্রথম বড় টেনিস টুর্নামেণ্ট গুয়াংজোতে অনুষ্ঠিত হল বটে, তবে শহরটি টেনিস বা খেলাধূলার তেমন বড় কেন্দ্র নয়।

ক্যাণ্টন ক্লাসিকের সময়ে ফ্রান্সের 'টেনিস ম্যাগাজিন'-এর জাইল ডি'লামার ও আমি ইণ্টারপ্রেটারের মাধ্যমে টেনিস অ্যাসোসিয়েশন অফ চায়নার সম্পাদক ইয়াং মিং সুনের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে মিলিত হই। ইয়াং-এর বয়স ৫০ মতন হবে। পরনে চীনা স্টাইলের পোশাক মাও কোট, গাঢ় নীল রঙের। টুর্নামেণ্টের সময়ে তাকে খুবই ব্যস্ত দেখছিলাম। তাও প্রেসরুমে আমাদের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ বসলেন। দোভাষীর মাধ্যমে কারুর সঙ্গে কথা বলা কিন্তু সহজ ব্যাপার নয়!

প্রথমেই ইয়াং জানালেন চীনকে সাহায্য করতে—অর্থাৎ চীনের প্রথম গ্রাঁ প্রি টুর্নামেণ্টকে সফল করতে। যে স্ট্যাণ্ডার্ডের প্লেয়াররা এসেছেন সে ব্যাপারে তিনি খুশী। বিশেষ করে জিমি কনর্সের মতন বিশ্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের তাদের সামান্য প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়াতে চীন টেনিস সংস্থা খুবই আনন্দিত।

ইয়াং বলেন, চীন দেশে টেনিস খেলা প্রথম চালু হয় ১৮৮৫ সালে। সে সময় পিকিং-এর ওয়াই ওয়ন হাই স্কুল আর ইউনিয়ন কলেজে ছাড়া শাংহাই-এর সেণ্ট জন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে খেলাটি বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। তবে টেনিস সরকারী স্বীকৃতি পায় ১৯১০-এ আর চীনের প্রথম জাতীয় গেমসে অন্তর্ভূক্তি লাভ করে।

পিপলস রিপাবলিক স্থাপিত হওয়ার পর টেনিস অ্যাসোসিয়েশন অফ চায়না গঠিত হয়। এখন এই সংস্থা চীন দেশের দশটার বেশি রাজ্যে নানা রকমের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে।

ইয়াং-এর আন্দাজ, তার দেশে এখন হাজার দশেক লোক টেনিস খেলেন। চীনে ২০০ মত টেনিস কোর্টে নিয়মিত খেলা চলে। তার মধ্যে প্রায় ৬০টি কোর্ট শাংহাইতে, আর ৩০টি বেইজিং-এ। খেলোয়াড়দের মধ্যে ৩০০ মত মোটামুটি ভাল ক্লাব স্ট্যাণ্ডার্ড প্লেয়ার বলে ইয়াং মিং সুন মনে করেন।

পঞ্চাশের দশকে রাশিয়া আর বর্মা থেকে দল আসে চীনে টেনিস খেলতে। কালচারাল রেভোলিউশনের আগে পাকিস্তান আর শ্রীলঙ্কার প্লেয়াররাও চীনে খেলে যায়।

তবে ১৯৭৬-এ কেন রোসওয়াল সমেত অস্ট্রেলীয় দল চীনে খেলবার পর থেকেই দেশের তরুণরা টেনিসের প্রতি আগ্রহ দেখাতে শুরু করেন বলে ইয়াং জানান। চীনের নানা রাজ্যে স্পোর্টস স্কুলের মাধ্যমে বহু ছেলেমেয়ে টেনিস শেখবার সুযোগ পায়। ইয়াং বলেন, তার দেশে টেনিস কোচের সংখ্যা দু'শোর উপর। তাদের মধ্যে প্রায় একশ জন ক্যাণ্টন ক্লাসিকের খেলা দেখতে গুয়াংজোতে হাজির।

বয়স-ভিত্তিক প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য চীনের খেলোয়াড়দের হংকং, রোমানিয়া আর ইতালীতে পাঠানো হয়েছে। তাছাড়া তিনজন মেয়েকে জাপান আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোচিং-এর জন্য পাঠানো হয়।

ইয়াং মিং সুন বলেন, জাপান ছাড়া চিলি, সুইজারল্যাণ্ড আর রুমানিয়ার টেনিস দলও সম্প্রতি শুভেচ্ছা সফরে চীনে এসেছিল বা আসছে। তিনি এই প্রসঙ্গে জানান যে চীনে টেনিসের উন্নতির সাহায্য করতে ভারত থেকেও এক দল পাঠাবার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

চীনে অধিকাংশ টেনিস খেলাই হয় শাং-হাইতে তৈরি 'এরোপ্লেন' মার্কা র‍্যাকেটে আর বলে। একটি সাধারণ র‍্যাকেটের দাম ১৬ য়ুয়ান—৮৪ টাকার মতন। ভারতের তুলনায় দাম কম।

ক্যাণ্টন টেনিস ক্লাবের প্রধান উ থো মিং-এর সঙ্গেও ডিলামার ও আমার কথা হয়। তিনি জানান গুয়াংজো শহরে সব নিয়ে ২৫০ জন নিয়মিত টেনিস খেলেন, তবে ক্যাণ্টন ক্লাসিকের পর এই সংখ্যা শীঘ্রই ডাবল হয়ে যাবে বলে তিনি মনে করেন। যারা নিয়মিত খেলেন, তাদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষক বা স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী।

গুয়াংজোতে থাকেন এমন অনেক বিদেশীও নিয়মিত টেনিস খেলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কনসাল-জেনারেলের ছেলে মার্ক উইলিয়ামস (বয়স ১৭) গুয়াংজো থেকে হংকং গিয়েছিলেন ক্যাণ্টন ক্লাসিকের প্রাথমিক পর্যায়ে খেলতে।

থো মিং বলেন, গুয়াংজং রাজ্যের রাজধানী ছাড়া অন্য কোথাও টেনিস খেলা চালু নয়। গুয়াংজোতে কতগুলি কলেজের নিজস্ব কোর্ট আছে, কলেজ অফ ফিজিকাল এডুকেশনে আছে পাঁচটি কোর্ট। তবে ক্লাব বলতে গুয়াংজোতে দুটিই আছে।

টেনিস খেলতে হলে ক্লাবের সদস্য হওয়ার প্রয়োজন নেই। যে খেলতে আগ্রহী তাকে টেনিসের প্রচারের জন্য বিশেষ কমিটির কাছে নাম লেখাতে হয়।

ক্যাণ্টন টেনিস ক্লাব হচ্ছে গুয়াংজো শহরের শা-মিয়েন দ্বীপে। এই এলাকায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিদেশীরা বসবাস করতে আরম্ভ করেন। ক্যাণ্টন টেনিস ক্লাব স্থাপিত হয় এই শতাব্দীর গোড়ার দিকেই।

একদিন শা-মিয়েন এলাকায় গিয়ে মনে হল, টেনিস ক্লাবটি দেখি। সত্যিই খুব সুন্দর পরিবেশ। কোর্টগুলির পিছনেই গুয়াংজো-এর নদী পার্ল রিভার (জু জিয়াং)। ক্লাবহাউসের উপর থেকে একসঙ্গে টেনিস খেলা আর নদী দেখা যায়। তবে ক্যাণ্টন টেনিস ক্লাবে একসময়ে ছিল সাতটি কোর্ট। এখন মাত্র দু'টি (চীনের সব জায়গাতেই ক্লে-কোর্ট, তবে ঠিক আমাদের লাল মাটির কোর্টের মতন নয়)—বাকিগুলির স্থানে তৈরি হচ্ছে আধুনিক হোটেল!

এর থেকে মনে হতে পারে, গুয়াংজোতে টেনিসের জনপ্রিয়তা কমে আসছিল। তবে এখন টেনিসকে জনগণের কাছে নিয়ে যেতে চীনা টেনিস সংস্থা বিশেষভাবে আগ্রহী।

একজন ভারতীয়র কাছে চীনের টেনিস জগৎ খুবই ছোট মনে হবে। তবে এটাও লক্ষ্য করবার ব্যাপার, প্রথম ক্যাণ্টন গ্রাঁ প্রি টেনিস ক্লাসিকে যে সব আম্পায়ার, লাইন জাজ, বল বয়, বল গার্লরা উপস্থিত ছিল তারা বেশ ভালই কাজ চালাচ্ছিল।

কয়েক বছরের মধ্যে হয়তো চীনে টেনিস সত্যিই জনপ্রিয় হয়ে উঠবে, আর চীনের খেলোয়াড়রা এশিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবার প্রচেষ্টা করতে থাকবে!

(চলবে)

ভারতীয় টেনিস দল আমন্ত্রিত

আগামী বছর ভারত থেকে একদল টেনিস খেলোয়াড় পিপলস্ রিপাবলিক অফ চায়নাতে শুভেচ্ছা সফরে যেতে পারে। গুয়াংজোতে মার্লবরো ক্যাণ্টন গ্রাঁ প্রি টেনিস ক্লাসিকের সময়ে চীনের টেনিস সংস্থার সম্পাদক ইয়ং মিং সুন জানান, ভারতীয় দল পাঠাবার জন্য, তারা নিখিল ভারত লন টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের কাছে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। কলকাতায় এব্যাপারে অল-ইণ্ডিয়া লন টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিলীপ বসুকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, আমাদের টিম যাবে কি না এখনও স্থির হয়নি। তবে এ মাসেই দিলীপবাবুর বেইজিং যাওয়ার কথা। সম্ভবত সেখানে ভারতীয় টেনিস দলের চীনে শুভেচ্ছা সফরে যাওয়ার ব্যবস্থা পাকাপাকি হতে পারে।



華米殊基士蘭
Ramesh Krishnan

於一九六一年六月五日生於印度馬德拉斯,
現仍居該處. 身高五呎七吋, 體重一百
四十五磅, 右手發球, 一九七九年得獎金
一萬三千三百四十一美元, 並爲一九七八年
溫布頓分齡大賽冠軍.
華米殊爲著名印度網球選手華密漢基士蘭

ক্যাণ্টন ক্লাসিক টেনিসের হ্যাণ্ডবিলে রমেশ কৃষ্ণণের পরিচিতি



মশা সব পালায় দূর-ঘুমটি আসে মিষ্টি মধুর!

বালসারার ওডোমস হল মশা তাড়ানোর ক্রীম। ওডোমস আপনার শরীরের চারপাশে এক সুরক্ষার আবরণ তৈরী করে মশাদের দূরে রাখে, যার ফলে আপনি নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমুতে পারেন।

বালসারার ওডোমস আধুনিক ও স্বাস্থ্য-সম্মত,এটি শিশুদের কোমল ত্বকের পক্ষেও নিরাপদ।

মশার শত্রু—বালসারার

ওডোমস



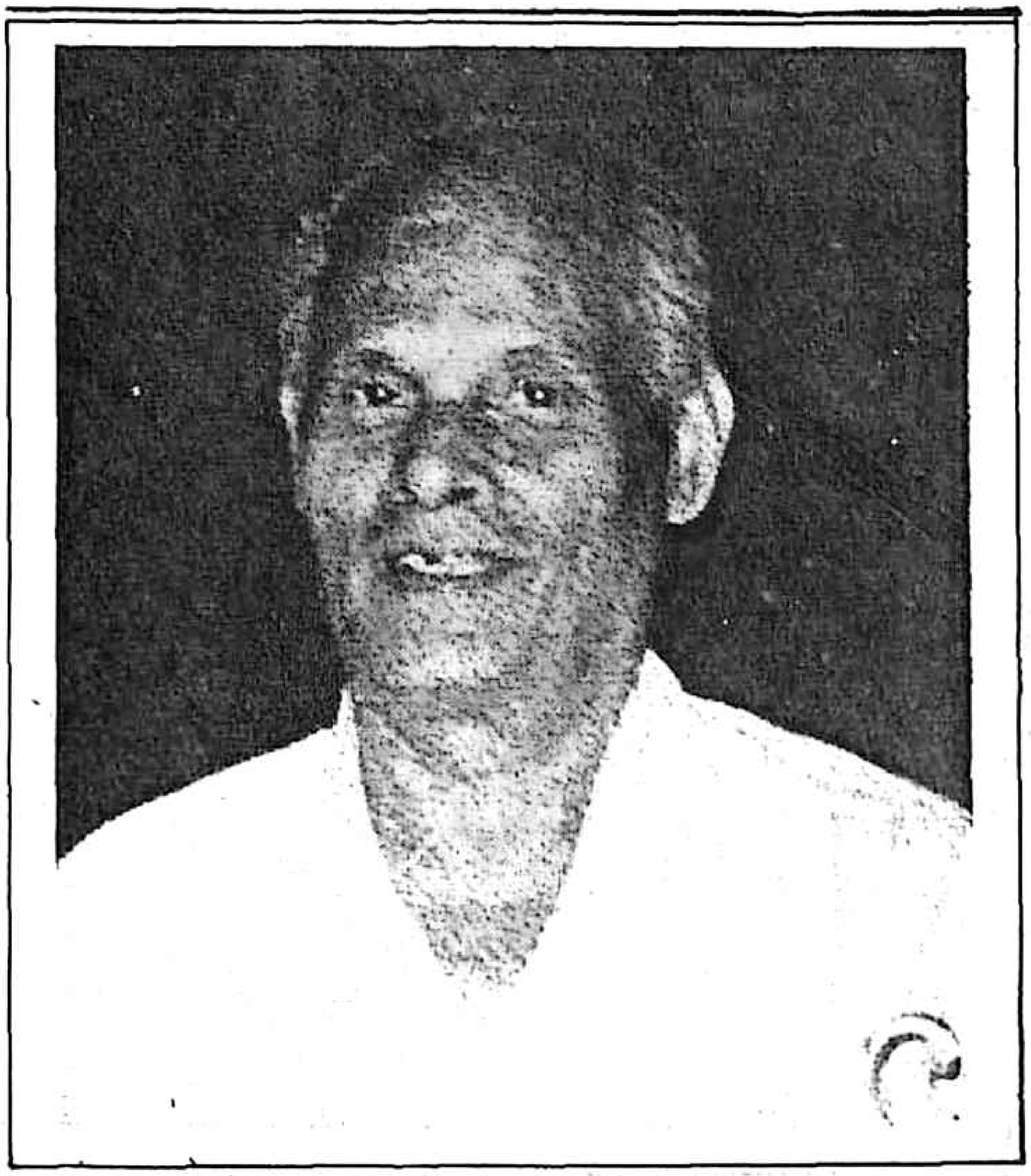
মশার হাত থেকে দীর্ঘকাল রক্ষাকারী সবচেয়ে আধুনিক প্রতিরোধক।

বালসারা
উন্নততর জীবনযাত্রার আধুনিক সহায়ক

BALSARA বালসারা অ্যাণ্ড কোম্পানী (প্রা.) লি.
৪৩ নাগীনদাস মাস্টার রোড বোম্বাই ৪০০ ০০১।

CHAITRA·BLS·243 BEN

কেমন মানুষ সুঁটে ব্যানার্জি



খেলোয়াড় হিসেবে অনেক আগেই তাকে হারিয়েছি। এখন হারালাম এমন একজন আদর্শ ক্রীড়ানুরাগীকে যার তুলনা তিনি নিজেই। ১৯৭১ সালে আমি পাতিয়ালায় কোচেস ট্রেনিং নিতে যাই। ইন্টারভিউ-এর সময় আমাকে প্রশ্ন করা হয় তুমি কি সুঁটে ব্যানার্জিকে জান? উত্তর: আমি কেন, ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের অনেকেই জানেন। যদিও তিনি মাত্র একটা সরকারী টেস্ট খেলেছেন। কিন্তু যদি তিনি পঞ্চাশেরও বেশি টেস্ট খেলতেন তাহলে কারও কিছু বলার ছিলনা। ভারতীয় দলে স্থান পাবার মত যোগ্যতা তার ঠিকই ছিল, কিন্তু নির্বাচকমণ্ডলীর চক্রান্তে সুযোগ তিনি পাননি। অনেকেই বলেন তার সময়ে নিসার হোসেন, অমর সিং-এর মত বোলার থাকতে তিনি কি করে স্থান পেতে পারেন। তিনি ছিলেন নিসার-এর পরই সবচেয়ে দ্রুত গতি সম্পন্ন বোলার। এটা শুধু আমার কথা নয় অনেকেই তা বলবেন। যদি রঞ্জি ট্রফি বা অন্যান্য প্রথম শ্রেণীর রেকর্ড এবং প্রথম শ্রেণীর খেলায় শেষ উইকেট জুটিতে তার বিশ্বরেকর্ডকে বিবেচনা করা হয় তাহলে অবশ্যই তাকে নিসার-এর জুটি হিসেবে ভারতীয় ক্রিকেট দলে স্থান দেওয়া উচিত ছিল। তিনি কেমন খেলোয়াড় ছিলেন বা কেন তিনি টেস্ট দলে স্থান পাননি সে সম্বন্ধে আজ কিছু লিখতে চাইনা। মানুষ হিসেবে তিনি কেমন ছিলেন সেই প্রসঙ্গেই লিখছি।

প্রথম যেদিন চিফ ক্রিকেট কোচ কাম এডভাইসার হয়ে আমাদের মাঝে এলেন সেদিন তার চেহারা এবং ব্যক্তিত্ব দেখে মনে মনে একটা ভয় ছিল—কি জানি তিনি আমাদের সঙ্গে কেমন আচরণ করেন। কিন্তু প্রথম দিন থেকেই তিনি আমাদের সমস্ত রকম ভয়কে দূরে ঠেলে দিয়ে এমন ভাবে আমাদের মাঝে মিশে গেলেন—মনেই হতনা তিনি একজন মস্ত বড় খেলোয়াড়, আর আমরা অতি সাধারণ। কোচিং-এর সময় তিনি নিজেও আমাদের সঙ্গে ব্যাট এবং বল করতেন। বয়স যেন তার কাছে কোনো বাধা নয়। খেলতে খেলতেই তিনি আমাদের কোথায় কি ত্রুটি তা বোঝাতেন। তখনই সত্যিকারের অনুভব করেছিলাম 'প্লে ওয়ে ইন এডুকেশন' কথাটার অর্থ কি। আবার প্রয়োজন মত কঠোরও হতেন। স্যার আশুতোষ মুখার্জি সম্বন্ধে বলা হয়—তার হৃদয় একদিকে যেমন কঠিন আর একদিকে তেমনি কোমল ছিল। সেদিন খেলার জগতে আর একজন তেমনি মানুষকে দেখলাম যার নাম সুঁটে ব্যানার্জি। একদিন খেলা শেষে তাকে তার বিগত খেলোয়াড় জীবনের ইতিহাস বলতে অনুরোধ জানাই। তিনি প্রায় চার ঘণ্টা ধরে তার সমস্ত ইতিহাস বলেন। শেষে তাকে বললাম, আপনার ঘটনাগুলো নিয়ে একটা বই লিখতে চাই। তিনি বলেন, আমার কোন আপত্তি নেই। শুধু একটা কথা, যাদের চক্রান্তে আমি সুযোগ পাইনি তাদের সেই চক্রান্তের কথা কিন্তু লেখা চলবে না। কারণ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে কারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আমি করতে চাই না। সেদিন বুঝলাম, খেলোয়াড় হিসেবে তিনি যত বড় তার চেয়েও বড় কথা তিনি ছিলেন সত্যিকারের স্পোর্টসম্যান। তিনি খেলেছেন খেলার আনন্দে। কোনদিন হিসেব করে দেখেননি তিনি নিজে কি পেলেন। যেদিন ট্রেনিং শেষ করে ফিরে আসব সেদিন তাকে বলি, আমি যেখানে থাকি সেটা একটা ছোট্ট শহর। সেখানকার ছেলেরা খেলাধূলায় খুবই আগ্রহী কিন্তু কোচিং-এর কোন ব্যবস্থা নেই। আপনি যদি একবার সেখানে কোচ দিতে যান তাহলে তারা খুবই উৎসাহিত হবে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলেন। দুর্ভাগ্য আমার এবং আমার শহরের ছেলেদের যে তাকে কতকগুলো বিশেষ কারণে আনতে পারিনি। আজ শুধু এইটুকুই বলতে চাই যে তার মত একজন কোচ প্রায় বিনা পারিশ্রমিকে সাধারণ একটা শহরে আসতে রাজী হয়ে যাবেন তা আজকালকার কোচদের কাছে একটা আশ্চর্যের ব্যাপার।

নীহাররঞ্জন চৌধুরী, এন আই এস (ক্রিকেট)।

সেরসা, আদ্রা সম্পর্কে প্রকাশিত রচনার প্রতিবাদ

গত ১৯ সেপ্টেম্বর '৮০ সংখ্যায় প্রকাশিত নিবন্ধ 'রেল সংস্থা, আদ্রা খেলাধূলায় শুধু পরিকল্পনা দিচ্ছে, লাভ হচ্ছে কোথায়?' নিবন্ধটি খাপছাড়া কিছু কথা এবং অসত্য তথ্যে ভরা।

এতে বলা হয়েছে সম্প্রতি এখানকার স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত বি এন আর বনাম এরিয়ান প্রদর্শনী ম্যাচটিতে আদ্রা সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের (সেরসা) ২৫০০ টাকা ক্ষতি হয়েছে। জানিনা আপনাদের প্রতিনিধি এ তথ্য কোথা থেকে পেলেন। সেরসা'র সভাপতি ইকবাল এস সন্ধুর পক্ষ থেকে আপনাদের জানাচ্ছি ওই ম্যাচে কোন ক্ষতি তো হয়ইনি, বরং সামান্য কিছু লাভই হয়েছে।

ওই লেখারই তৃতীয় প্যারায় আরও বলা হয়েছে যে আদ্রার ক্রীড়ামোদী মানুষ সেরসার কর্তাব্যক্তিদের পারস্পরিক বনিবনা সম্পর্কে সন্দিহান। আমার প্রশ্ন, এধরনের বিভ্রান্তিমূলক সংবাদ লেখক লেখেন কিভাবে। উনি কি আদ্রার ঘরে ঘরে গিয়ে খোঁজ নিয়েছেন?

লেখক প্রথম প্যারায় সেরসার কাজকর্মে আদ্রার খেলাধুলো ও খেলোয়াড়রা অবহেলিত হচ্ছে বলে অনেক যুক্তি তথ্য হাজির করেছেন। অথচ পঞ্চম প্যারায় গিয়ে আদ্রা ডিভিসনের বিভিন্ন কেন্দ্রে খেলা ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে সেরসার উদ্যোগকে বেশ প্রশংসা করেছেন। আশ্চর্য গরমিল।

আমরা যেকোন গঠনমূলক সমালোচনাকে স্বাগত জানাই। কিন্তু ওই নিবন্ধ এখন খেলার জগতে যে উত্তেজনা চলছে তাতে প্রকাশ করা কি উচিত হয়েছে? আমার অনুরোধ ওই লেখা পড়ে জনমানসে যে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে আমার এ পত্র প্রকাশ করে তার অবসান ঘটাবেন।

এন বিশ্বাস/স্পোর্টস অফিসার, সাউথ ইস্টার্ন রেল, আদ্রা।

ভিক্ষা-মুষ্ঠির বিনিময়ে ক্ষত-বিক্ষত মাঠ-ময়দান

'সার্কাস হঠাও—মাঠ বাঁচাও'। আওয়াজ তুলেছিলে লালগোলার ফুটবল প্রেমী মানুষজন। বহু অনুনয় উপরোধেও মন ভেজেনি তাদের। দৃঢ়মুষ্টিতে ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদের কাছে হার মেনেছিলেন সেখানকার প্রশাসনিক কর্তারা। সার্কাস কোম্পানিকে তাই তাঁবু গুটিয়ে ফেলতে হয়েছিল।

মুর্শিদাবাদের এক মফঃস্বল শহরের এই ক্রিয়াকাণ্ডের কথা রাষ্ট্র হয়েছিল আশপাশের সর্বত্র। সে বছর দুই আগের ঘটনা। এর পরেও শিক্ষা নেয়নি জেলাবাসীরা। বেলডাঙা, বহরমপুর বা রঘুনাথগঞ্জ সর্বত্রই গত দু'বছরে একাধিক সার্কাস কোম্পানির তাঁবু পড়েছে। জেলার বুকে গুটিকয় খেলার মাঠ। তাকেও ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়ে গেছে তারা ভিক্ষা-মুষ্ঠির বিনিময়ে। প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ঝড় ওঠেনি কোথাও। অতীত দিনের জনা কয় খেলোয়াড় সহ্যের বাঁধ ভেঙে ছুটে গেছিলেন শহরের ক্লাবগুলোর কাছে। গেছিলেন প্রশাসনের জাঁদরেল কর্মকর্তাদের কাছেও। হয়নি কিছুই। সার্কাস শো-এর 'ফ্রি পাশ'-এর হাতছানিতে মাথা বিকিয়ে দিয়েছিলেন করিৎ কর্মার দলেরা।

এইভাবে ফি-সন মুর্শিদাবাদের মাঠ-ময়দান ক্ষত-বিক্ষত করছে সার্কাসের দল শহরের বা গ্রামের প্রসিদ্ধ ময়দানের বুক চিরে সার্কাসগুলির মাসাধিক কালের অবস্থান এ জেলায় ফুটবলের অনুশীলনকে দিন দিন পিছিয়ে দিচ্ছে। এমনিতেই এ জেলা ফুটবলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নীচুতলার সৈনিক। ক্রিকেটেও অনেক পিছিয়ে। গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার যন্ত্রণায় তাই টনটনিয়ে উঠছে মুর্শিদাবাদের ক্রীড়াঙ্গন।

জেলা ও চারটি মহকুমা ক্রীড়াক্ষেত্রের ইজারাদারদের মুখে কুলুপ আঁটা। বহরমপুর জেলা শহরে বিকল্প ময়দানের ব্যবস্থা থাকায় অবস্থাটা অতটা ভয়াবহ হয়ে উঠছে না এই মুহূর্তে। অন্যান্য মহকুমা শহরে

বিকল্প মাঠ নেই। রঘুনাথগঞ্জের একমাত্র মাঠটির স্বত্বাধিকারী জঙ্গীপুর স্কুল। মাঠ ব্যবহার হয় তাদের ইচ্ছে মতন। খেলাধূলা করে রঘুনাথগঞ্জের বিভিন্ন ক্লাবের ছেলেরা। তিনবার পরপর সে মাঠে সার্কাস বসেছে। শোনা যাচ্ছে এবারও আসছে।

এ নিয়ে গুটিকয় যুবক স্কুল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। স্কুলের হেড মাস্টার মশাই তাদের বলেছেন —স্কুল মাঠে নাকি বেগুন চাষ করবেন!

বিমান হাজরা।

বুম্বাকে বাঁচাতে পারি

খেলার আসর পড়ে জানতে পারলাম সুভাষদার ছেলের কিভাবে ক্যান্সার হয়েছে। কিন্তু খেলার আসর কর্তৃপক্ষ থেকে জানিয়েছেন, আমরা কি পারি না একটি অবুঝ শিশুকে বাঁচাতে। 'আমি বলছি, হ্যাঁ পারি, আমি সবকিছুর জন্য প্রস্তুত, শরীরের যে কোন অংশ দিতে পারি সুভাষদার ছোট্ট শিশু পুত্রের জন্য। আপনারা জানান কিভাবে যোগাযোগ করলে তাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানো যেতে পারে। সুভাষদার ছেলের বাঁচা দরকার। একমাত্র পুত্র মা বাবার কাছ থেকে চলে যাবে? না, তা হয় না, তা হতে নেই। তার থেকে আমাদের কেউ একজন গেলে ক্ষতি নেই। বুম্বাকে বাঁচান। সুভাষদাকে বলুন আমরা আছি। আমার দেহের যে কোন অংশ দিয়ে যদি ওকে বাঁচানো যায় তা দিতে আমি প্রস্তুত। অবশ্যই জানান। আকুল নয়নে তাকিয়ে রইলাম বুম্বা কবে ভালো হবে।

আমি আমার ঠিকানা দিলাম যোগাযোগ করবেন। কোন অসুবিধা নেই।

চন্দনা বসু, ১২ বি পশুপতি বসু লেন, কলকাতা-৩।

আর এক সুভাষকে দেখতে চাই

সুভাষ ভৌমিক—ভারতীয় ফুটবলে এক অতি পরিচিত নাম! যে সুভাষ একদা ময়দান কাঁপাত, যে সুভাষ যেকোন ভারতীয় ডিফেণ্ডারের ভয় স্বরূপ ছিল—সেই সুভাষ আজ অত্যন্ত বিপন্ন। তার পুত্র 'বুম্বা' আজ দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত। আমাদের নিকট এটা অত্যন্ত মর্মান্তিক। যে সুভাষ একদা ভারতীয় ফুটবলকে অনেক কিছু দিয়েছেন, যে সুভাষ একদা তার ক্রীড়াশৈলীর পরিচয় দিয়ে মাতিয়ে রেখেছিলেন, আমাদের সেই প্রিয় খেলোয়াড়টির এই বিপন্নাবস্থায় আমাদের সকলের এগিয়ে আসা উচিত বলে আমি মনে করি। আশা করি, আমাদের সরকারও এ বিষয়ে তাকে সাহায্য করবেন। 'খেলার আসরে'র কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই এই সংবাদটি আমাদের অবহিত করার জন্যে। যে সুভাষ কোনদিন পরাজিত হননি, সেই অপরাজিত সুভাষ আশা করি এবারও জিতবেন। তবেই হয়তো আমরা কয়েক বছর পর ময়দানে আরেক সুভাষকে দেখতে পাবো।

শান্তনু দাসগুপ্ত, বিধাননগর, মেদিনীপুর।

খেলোয়াড়রা দায়ী নয়

২০ অক্টোবর টেলিভিশনের পর্দায় ১৯৭৮-এর বিশ্বকাপের ফুটবল ফাইনাল খেলা দেখলাম। এতে আর্জেণ্টিনা ও হল্যাণ্ড মুখোমুখি হয়েছিল, খেলা হয়েছে খুব পরিচ্ছন্ন। না হলেও সুন্দর। এই খেলা দেখে একটা কথাই বার বার মনে আসছে যে ফুটবলে আমরা কত পিছিয়ে, এদের ধারে কাছে যাবার যোগ্যতাও আমাদের নেই। খুব সুন্দর পাসিং-এর মারফত খেলাটি খুব উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। যাকে বলে সত্যিকারের টাফ ফুটবল তা দেখতে পেলাম এদিনের খেলায়। মোটের উপর খেলাটি খুব উপভোগ্য হয়েছিল সন্দেহ নেই।

এবার আমি বলি-যে, এই খেলা যাদের সবচেয়ে দেখা উচিত তারা হলেন কলকাতার উন্মাদ দর্শকরা, যারা নিজেদের ফুটবলপ্রেমী হিসেবে জাহির করেন। আমাদের ফুটবল যে এত অনুন্নত তার জন্য আমরা অর্থাৎ দর্শকেরাই দায়ী বলছি, কারণ, ১৯৭৮ এর বিশ্বকাপ ফুটবল ফাইনাল খেলা কলকাতার তুচ্ছ লিগ শিল্ড ঘরোয়া প্রতিযোগিতার থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তবুও মাঠে খেলোয়াড়ে খেলোয়াড়ে ধাক্কাধাক্কি, ফাউল, রোখারোখি সবকিছুই হল কিন্তু যেমনি তাদের রেফারির পরিচালনার সুন্দর পদ্ধতি, তেমনি দর্শকদের মানসিক ধৈর্য। মাঠে উভয় পক্ষের দর্শক থাকলেও সেখানে ১৬ আগস্ট ১৯৮০-এর ইডেনের সেই দৃশ্য দেখতে পেলাম না—তবে কি?

বাপী মুখার্জি, ঠাকুরপুকুর, (বাছাড়পাড়া) কলকাতা-৬৩।

অনবদ্য শারদীয় খেলার আসর

শারদীয় খেলার আসর এককথায় 'অনিন্দ্য সুন্দর'। তার প্রধান কারণ এর কয়েকটা রচনা।

'খেলার মাঠের সেই মানুষটিকে ভুললাম কেন' এটা আমাদের কাছে এক অবাক করা রচনা। এর জন্য লেখক অতুল মুখার্জিকে ধন্যবাদ দেবার ভাষা নেই। এছাড়া চিরঞ্জীব, সুধীর চক্রবর্তী, সুদেষ্ণা বড়ুয়া প্রমুখের রচনাও খুব সুন্দর। অশোক চট্টোপাধ্যায়ের 'সিটিয়াস' উপন্যাস অতুলনীয়। বাকি দুটোর মধ্যেও প্রচণ্ড উত্তেজনা ও কৌতুক আছে। এই সংখ্যার ছবিগুলোর জন্য ফটোগ্রাফারদের অশেষ ধন্যবাদ। এই সংখ্যাটা পড়লেই বোঝা যায় যে খেলার আসর আজ কত উন্নত। আমরা পাঠকরা আশা করি যে ভবিষ্যতে খেলার আসর আরও পরিণত হবে।

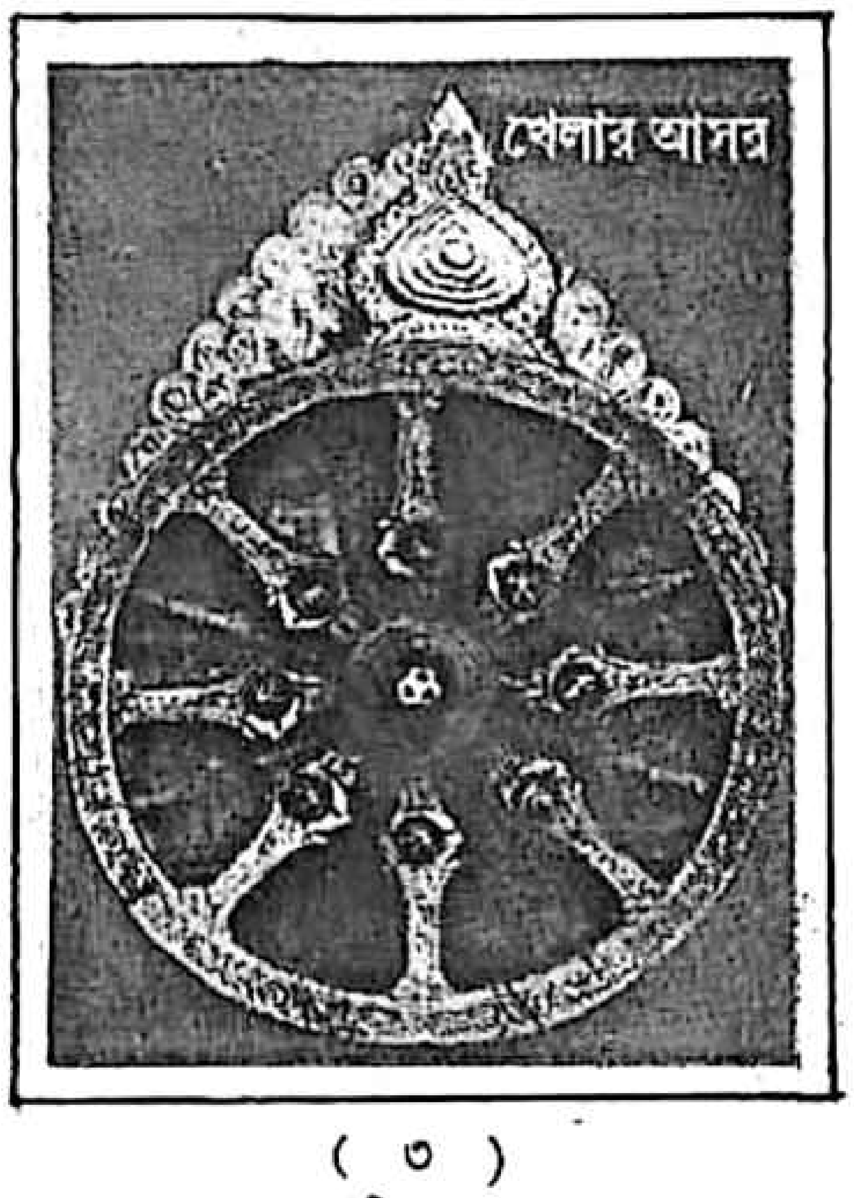
অমিত রায়, এম/৪৭, আদ্রা, পুরুলিয়া।

(২)

আমি 'খেলার আসর'-এর একজন নিয়মিত পাঠক। তাই কোন সংখ্যা যদি দেরীতে প্রকাশিত হয় তখন খুবই খারাপ লাগে। শারদীয় সংখ্যায় অশোক চট্টোপাধ্যায়ের 'সিটিয়াস' উপন্যাসটি পড়লাম। এত ভাল লেগেছে যে ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। এই রকম উপন্যাস সাধারণ সংখ্যাতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করলে খুবই ভাল হয়। এজন্য আমি 'খেলার আসর'-এর সম্পাদক মহাশয়কে ভেবে দেখবার জন্য অনুরোধ করছি।

সুনীল বসুর 'রাবণ রান আউট', রূপক সাহার 'কলকাতার বিশ্বকাপ ফুটবল ফাইনালে ভারত', সুধীর চক্রবর্তীর 'ঠাকুরবাড়িতে খেলাধূলা' এই রচনাগুলি এককথায় দারুণ হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য রচনাগুলিও আকর্ষণীয় হয়েছে। রঙিন ছবিগুলি অপূর্ব সুন্দর হয়েছে। এজন্য আমি অমিয় তরফদার, অরুণ মুখার্জি, অর্ধেন্দু রায়, সমর তরফদার, তপন রায়, পাহাড়ী রায়চৌধুরী, শঙ্কর নাগ দাসকে অজস্র ধন্যবাদ জানাই। এত অল্প মূল্যে এত চমৎকার পত্রিকা আমার কাছে আশার অতিরিক্ত হয়েছে। পরিশেষে, বইটির সকল লেখক, ফটোগ্রাফার ও কলা-কুশলীদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। 'খেলার আসর'-এর কাছে আমি আরও আশা করি।

চন্দন দাস, প্রযত্নে—চিত্তরঞ্জন দাস, পোঃ—বিনোভা নগর, কাহেলীপাড়া কলোনী, গৌহাটি-৭৮১০১৮, আসাম।



(৩)

এবারের শারদীয় খেলার আসর এক-কথায় অভূতপূর্ব। এবারের শারদীয় খেলার আসরের কোন তুলনা নেই। অশোক চট্টোপাধ্যায়ের 'সিটিয়াস' এক কথায় শ্রেষ্ঠ। সুনীল বসুর 'রাবণ রান আউট' খুবই আকর্ষণীয়।

সুমন্ত কুমার দাস, পার্ক রোড, শিলচর।

(৪)

খেলার আসর পত্রিকার পূজা সংখ্যা পড়লাম। এককথায় অতুলনীয়, অপূর্ব। রেখায় লেখায়, অলংকরণে ও প্রচুর ভাল ভাল ছবিতে ঠাসা এই সঙ্কলনটি ক্রীড়া পত্রিকা জগতে এক অপূর্ব নজীর সৃষ্টি করল। 'রাবণ রান আউট' নামক ব্যঙ্গাত্মক রম্য রচনাটি চমৎকার। অন্যান্য রচনারও তুলনা নেই। শুধু ধন্যবাদ দিয়ে আপনাদের ঋণ শোধ করার স্পর্ধা আমার মত সাধারণ গ্রাহকের নেই, তবে মঙ্গলময় ঈশ্বরের কাছে আমার শুধু এইটুকুই প্রার্থনা যে লোডশেডিং এর দাপট থেকে ও নিউজপ্রিন্টের দুষ্প্রাপ্যতার হাত থেকে তিনি যেন একে রক্ষা করেন। পত্রিকা যেন নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে বাংলা তথা বাংলার বাইরের ক্রীড়ামোদী পাঠকদের মনের খোরাক চিরদিন যুগিয়ে যেতে সমর্থ হয়।

শঙ্কর প্রসাদ কালী, ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ।

(৫)

উৎসব মুখরিত শারদীয় পূজার মহা-সমারোহে আকাশ-বাতাস যখন মুখরিত, তারই মাঝে রঙে রঙে রঞ্জিত নতুন নতুন ক্রীড়া সংবাদে ভরপুর এক এবং অনন্য প্রচারিত সহস্র সহস্র ক্রীড়ামোদীদের সম্মুখে শারদীয় খেলার আসর আর একবার সকলের হৃদয় জয় করেও ক্ষান্ত হয়নি, অপূর্ব রঙীন অ্যালবামে সজ্জিত, অতুলনীয় রচনা-বলী সকলের দৃষ্টি আকর্ষক খেলার আসরের শ্রেষ্ঠত্ব পুনরায় প্রমাণ করল। সংখ্যাটি এক কথায় শরতের উজ্জ্বল জ্যোৎস্না ধারায় উজ্জীবিত। সবশেষে কামনা করি খেলার আসর আরও জনপ্রিয় হয়ে চির-ভাস্বর হয়ে আমাদের মাঝে দীর্ঘায়ু হোক।

এস এন রায়, শিলবেড়িয়া, পোঃ– উলাসী, নদীয়া।

(৬)

সব পত্রিকার তো শারদীয় সংখ্যা দেখলাম, কিন্তু খেলার আসর শারদীয় সংখ্যার মত জাঁকজমকপূর্ণ পত্রিকা এখনও হাতে পাইনি। বইটাকে কাছে পেয়েই মাত্র চার ঘণ্টায় পড়ে ফেলেছি। তারপর সব বন্ধু-বান্ধবদের পালা। আজ এক বন্ধু চেয়ে নিয়ে যায় আবার কাল আর এক বন্ধু নিয়ে যায়। পত্রিকার তিনটি গল্প পড়ে সত্যিই খুব ভাল লেগেছে। সুনীল বসুর 'রাবণ রান আউট' গল্পটি পড়ে হেসে হেসে গড়াগড়ি খেয়েছি। বন্ধু-বান্ধবদের কাছে গল্পটা শোনাতে তারাও হেসে লুটোপুটি। সত্যিই খেলার আসরের রঙীন ফটোগুলো দেখে চমকে উঠেছি। মনে হয়েছে, বইয়ের ফটো এত সুন্দর হল কি করে? যারা ফটোগুলো তুলেছেন তাদেরকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। আশা করি পরের বছর শারদীয় সংখ্যার আকর্ষণ আরও বেড়ে যাবে। যাদের সহযোগিতায় শারদীয় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছে তাদেরকে এবং আমার প্রিয় খেলার আসরের সমস্ত পাঠক-পাঠিকাদের জানাই শুভ বিজয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন।

স্বরাজ সাহা, ডায়মণ্ডহারবার, ২৪ পরগণা।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক অরুণকুমার পাল কর্তৃক ইত্যাদি প্রকাশনী (প্রাঃ) লিমিটেড প্রেস, ৭৭/২/১ লেনিন সরণি, কলকাতা ৭০০০১৩, (ফোন ২৪-৫৫২০), থেকে মুদ্রিত ও ইত্যাদি প্রকাশনী (প্রাঃ) লিমিটেড, ৪৭ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭২, (ফোন ২৭-৩৩১৬, ২৭-২১৬৯), থেকে প্রকাশিত

তুষার নিয়ে খেলা

(তেত্রিশ)

আলেখ্য ঃ ভাল্টার নয়গেবাউয়ার
অনুবাদ ঃ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত



Registration No. 30198/77 KHELAR AASAR 7th November 1980 WB/CC—334/77 Rs. 1.50

